Bangla E-Library

পরাশর সমগ্র

pathagar.net

প্রেমেন্দ্র মিত্র

“

পরাশর বর্মা ওই নামে গোয়েন্দা হিসাবেই অবশ্য আমায় দেখা দেয়নি। তবে ঘটনাচক্রে [illegible] অসংলগ্ন ব্যাপার এক সঙ্গে জড়িয়ে ওই [illegible] আভাস আমার মনে যেন [illegible] তুলেছিল।

•

কবি হয়েও পরাশর বর্মাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, কিন্তু শার্লক হোমস, পোয়ারো কি [illegible] কারও সঙ্গে কোনও [illegible] তার নেই। [illegible] চেষ্টাও সে কখনও করে না।

”

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অগ্রন্থিত গল্প

কৃত্তিবাসের অজ্ঞাতবাস • ৬৪১
তুরুপের তাস চুরি • ৬৪৯
পরাশরের শর • ৬৫৬

পরিশিষ্ট

সুন্দ-উপসুন্দের আধুনিক উপাখ্যান • ৬৬৫

pathagar.net

কৃত্তিবাসের অজ্ঞাতবাস

চিৎকার করে উঠেছি আতঙ্কে।

তারপর পড়ি কি মরি ছুট দিয়েছি একেবারে উন্মাদের মতো।

হ্যাঁ, আমি স্বয়ং শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার না করে পারছি না যে পাঁচ বছরের আটাশে ছেলের মতো ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালিয়েছি।

ভয়টা যা নিয়ে সেইটেই হল সবচেয়ে লজ্জার। ভয়টা বাঘ-ভালুক সাপ-খোপ চোর-ডাকাতের নয়।

ভয়টা ভূতের, এবং সে ভৌতিক অভিজ্ঞতাটা আমার প্রত্যক্ষ। প্রথমেই কল্পনা করতে বলি একটা গড়-প্রমাণ বাড়ির বিরাট ধ্বংসস্তূপ। চারিদিকে ছড়ানো ভাঙা ইট, কাঠ, জঞ্জালের ঢিবিগুলোই বাড়িটাকে অগম্য করে রেখেছে। তার ওপর আছে গোলকধাঁধার মতো তার ভেতরকার জটিল যাওয়া-আসার সব রাস্তা, ধসে-পড়া বাড়িতে যা জায়গায় জায়গায় ভয়াল সুড়ঙ্গের রূপ নিয়েছে।

এ রকম একটা ধ্বংসপুরীর সঙ্গে ভূতের ভয় আপনা থেকে জড়ানো থাকে জানি। রজ্জুতে তাই সর্পভ্রম হয়—আলো-ছায়ার নকশাকে মনে হয় অশরীরী কারও আভাস, সামান্য দরজা-জানালার নড়চড়াতে বিকট আওয়াজের বিভীষিকা হাত-পা অবশ করে দেয়।

কিন্তু সে রকম কোনও ভ্রান্তি আমার হয়নি, স্বভাব-ভীরুও আমি নই। ভূত প্রেত আমার কাছে হাসির ব্যাপার বলে আমি নিজে থেকে জোর করে কাউকে কিছু না জানিয়ে এ ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করতে গিয়েছি, আর তারপর—

তারপর সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে সে ধ্বংসপুরী থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেছি।

সাধারণ হিসাবে মোটামুটি সাহসী ও যুক্তিবাদী হলেও এমন আতঙ্কে কী করে অভিভূত হলাম বোঝাবার জন্যে ঘটনাটা একটু বর্ণনা করতে হয়।

আবছা একটি নারী মূর্তি ধ্বংসপুরীর গোলকধাঁধার মতো আঁকাবাঁকা জড়ানো পথ দিয়ে কখনও প্রত্যক্ষ কখনও চোখের আড়াল হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সব রহস্যের সমাধান আমার হাতের মুঠোয় মনে করে সাফল্যের আনন্দে নিঃশব্দে আমি তাকে অনুসরণ করেছি।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থামতে হয়েছে। শুভ্রবসনা মূর্তিটি একটা জানলার ধারের অন্ধকারে কী যেন দেখবার জন্য মাথা নিচু করে উঁকি দিচ্ছে। দেখার চেষ্টা করছে বোধহয় আমাকেই। সুতরাং এই সুযোগ।

নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত ধরে টান দিয়েছি।

পরের মুহূর্তে আতঙ্ক-বিহ্বল গলা দিয়ে চিৎকারটা আপনা থেকে বেরিয়ে গেছে। কোমল উষ্ণ হাতটা তখনও আমার হাতের মধ্যে ধরা আর মূর্তিটার কোনও চিহ্ন নেই। হ্যাঁ, সত্যিই আমার টান দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা হাতটা গরম একটা তরল কিছুতে আমার গা ভিজিয়ে আমার হাতেই খুলে এসেছে, আর সভয়ে শিউরে সেটা ফেলে দেবার পর মূর্তিটা যেন

চোখের ওপরই গিয়েছে মিলিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মতো বোঝাবার জন্য এ বিবরণ এখানে থামিয়ে গোড়া থেকেই শুরু না করলে নয়। তাই করছি।

একেবারে পুরোপুরি ডুব দিতে পেরেছিলাম।

এমন অতল ডুব যে ওপরে দুটো বুজকুড়িও উঠবে না।

একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস যাকে বলে। রেল স্টেশন কমপক্ষে বিশ ক্রোশ দূর। পোস্টাফিস পর্যন্ত পুরো একবেলা হেঁটে তবে পৌঁছনো যায়।

জায়গাটা অবশ্য বাংলা দেশেই। নামটা বলব না। বললেই যে কেউ চিনে ফেলবেন এমন সম্ভাবনা অবশ্য নেই। তবু নামটা একটু পালটে নিজস্ব অঞ্চলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঝুমুরডি-ই রাখলাম। জায়গাটা সম্বন্ধে খুব বেশি কৌতূহল থাকলে অবশ্য ম্যাপটা খুলে দেখতে বলব। দক্ষিণে সুবর্ণরেখা আর উত্তরে রূপনারায়ণকে রেখে যে নদীটি হুগলি নদীর মোহানায় বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে সেই পোশাকি নামের কংসাবতী যদি বা আমাদের কিছুটা চেনা হয় তার সেবিকা সখী কুমারীর নাম খুব বেশিজন জানে বলে মনে হয় না।

আমাদের পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তের সবচেয়ে শুকনো জেলায় সেই কুমারী নদীরই আবার দুটি শাখার মাঝখানের যে জায়গাটা নেহাত বিশেষ মানচিত্রে ছাড়া প্রায় ফাঁকা চিহ্নহীন দেখায়, তারই মাঝখানের একটি গ্রাম এই ঝুমুরডি।

কী রকম গ্রাম ঝুমুরডি তার আর একটু আভাসও দেওয়া যেতে পারে। মোটের ওপর ছড়ানো ছিটোনো বেশির ভাগ খোড়ো চালের কুঁড়ে আর খামারবাড়ি, হাজা-মজা ক-টা পুকুর ডোবা আর চুড়ো ভাঙা একটা মন্দির নিয়েই ঝুমুরডি গ্রাম। হপ্তায় একবার যেখানে অতি দুখিনী একটা হাট বসে। সেই জটির থানের একমাত্র মুদির দোকানে ছাড়া টিনের চালও একটা দেখা যাবে না। গ্রামের চিরকাল যে এ দশা ছিল না তার অবশ্য কিছু প্রমাণ এখনও একেবারে লোপ পায়নি। সে প্রমাণের একটা যেমন নাগেরবাঁধ। এখন ভেতরটা শুকনো পিপাসী মাঠেরই শামিল। চারধারের উঁচু বাঁধও অগুনতি ফুটো ফাটল নিয়ে বছরের পর বছর ভেঙে ধসে যাচ্ছে। বর্ষার পর ক-দিনের জন্য ভেতরের নামাল জমিতে যে সবুজের ছোপটুকু লাগে তা থেকে এ বাঁধ যখন অতিবৃষ্টির দিনের জল ধরে রেখে অনাবৃষ্টির দিনে সারা গাঁয়ের ফসলের জল জোগাত, সেই সাবেকি গৌরবের দিনের একটু আভাস হয়তো পাওয়া যায়।

আর আভাস পাওয়া যায় নাগেরবাঁধের ঠিক বিপরীত দিকের গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তের হাজা-মজা ডাকাতে বিলের ধারের সেই বিরাট আধা ভগ্নস্তূপটায়, যার গড়মাদার নামটার মধ্যেই জমকালো দূর অতীতের ঝলক একটু আছে। গড়মাদার যে কত কালের পুরনো ধ্বংসস্তূপ তা নিয়ে কেউ গবেষণা করেনি। বহুকাল সেটা অব্যবহারেই পড়ে ছিল। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে তার ওয়ারিশনদের কে একজন বৃদ্ধা বিধবা ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই কোনওরকমে একটা মাথা গোঁজবার ঘরে আশ্রয় নিয়ে আছেন। গড়মাদারের ওই ভুতুড়ে পোড়ো ভিটের ওপর লোভ করবার মানুষ গাঁয়ে নেই বলেই বৃদ্ধা বিধবার উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। বৃদ্ধা আসবার আগেও যেমন তিনি আসবার পরেও তেমনই গাঁয়ের লোক ওই ধ্বংসপুরীর ত্রিসীমানাও পারতপক্ষে মাড়ায় না।

সারা গাঁয়ে দালান কোঠা বলতে ওই পোড়ো গড়মাদারকে বাদ দিলে খড়ের চাল হলেও কাঁচা ইটের দেওয়ালের একটি যে বাড়ি আছে নাগেদের সেই কাছারি বাড়িতেই আমি উঠেছি। নাগেদের অনেক পুরুষের বেশকিছু জমিজমা এখানে ছিল। জমিদারি উঠে গেলেও নতুন বিলিব্যবস্থা করবার কাছারি বাড়িটা এখনও চালু আছে। নাগেদের এক ছেলের লেখাটেখার শখ। আমার কাগজে লেখা নিয়ে আসার সূত্রে আলাপ হয়েছে। সেই আলাপে এই গ্রাম আর তাদের কাছারি বাড়ির কথা জানতে পেরে নিজে থেকেই এখানে এসে কিছুদিন থাকবার সুযোগটা চেয়ে নিয়েছি।

কিন্তু দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে এমন একটা অখদ্দে গাঁয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন কেন? শুধু একটা বাজির জন্য।

হ্যাঁ, বাজিটা পরাশরের সঙ্গেই। নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে কথায় কথায় একদিন তাকে তাল ঠুকে বলেছিলাম যে যত বড় ধুরন্ধরই সে হোক, ইচ্ছে করলে এমন গা ঢাকা দিতে পারি যে এক মাসের মধ্যে আমায় খুঁজে বার করা তার সাধ্য হবে না।

পরাশর প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু এমন একটা মুখটেপা হাসি হেসেছিল যাতে গায়ের জ্বালায় তখনই বাজি ধরে বলেছিলাম, 'এই রইল তোমার সঙ্গে বাজি, যেদিন আমি অন্তর্ধান হব তার পর থেকে একমাসের মধ্যে তুমি আমার খোঁজ পাবে না। কী, রাজি আছ এ বাজি রাখতে?'

এবার একটু যেন দমে গিয়ে পরাশর বলছিল, 'রাজি যদি হই তো বাজিটা কী হবে?'

'বাজি?' দু-সেকেন্ড ভেবেই চটপট বলে দিয়েছিলাম, 'আমি যদি হারি তো পর পর চার হপ্তা তোমার কবিতা আমার কাগজে ছাপব। আর তুমি যদি হারো তা হলে একমাস আর কবিতা লিখবে না।'

'একমাস কবিতা লিখব না!' পর পর চার হপ্তা কবিতা ছাপার কথায় পরাশরের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখটা এক মাস কবিতা না লেখার কথায় কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছল। বলেছিল, 'বাজিটা ঠিক ন্যায্য হচ্ছে না। তবু তোমার সুমতির আশায় রাজি হচ্ছি।'

পরাশরের সঙ্গে এই বাজি রাখার দিন পাঁচেকের মধ্যে একদিন উধাও হয়েছিলাম। যাবার আগে পরাশরকে ডাকে শুধু একটা পোস্টকার্ড দিয়েছিলাম আমার অজ্ঞাতবাস শুরু হওয়ার তারিখটা রেকর্ড করে রাখবার জন্য।

ঝুমুরডিতে নাগেদের কাছারি বাড়িতে এসে ওঠবার পর পরাশরের জন্য একটু দুঃখই হয়েছে। সত্যি, বাজিটা ঠিক ন্যায়সংগত হয়নি। আমি হারলে তো চারবার পর পর পরাশরের কবিতা ছাপিয়েই খালাস। কিন্তু হেরে গেলে পরাশরের শাস্তিটা যে অনেক গুরুতর। পুরো একটি মাস কবিতা না লিখে থাকাটা তার পক্ষে যে কী যন্ত্রণার তা তো আমি ভাল করেই জানি। একমাস চোখ বেঁধে কাটিয়ে দেওয়া বরং তার কাছে অনেক সহজ।

বাজির শর্তে তার ওপর যে বেশি রকম অন্যায় অবিচার করা হয়েছে সেটা আরও ভাল করে বুঝেছি সারারাত ধিকিধিকি এক প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাটিয়ে সকাল সাতটার পর ধু ধু মাঠের মধ্যে প্রায় ভুলে-যাওয়া এক স্টেশনে নেমে। স্টেশনের নাম উর্মা। জানা না থাকলে টাইমটেবল ঘেঁটেও সহজে কেউ বার করতে পারবে বলে মনে হয় না। এই স্টেশন থেকেই সনাতন গোরুর গাড়িতে আন্দাজ বিশ ক্রোশ ভেঙে ঝুমুরডি যেতে যেতে পরাশরের করুণ অবস্থার কথা ভেবেছি। আমার চিঠিটা পাওয়ার পর সে আমার ঠিকানা বার করবার জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু অত বড় কলকাতা শহর থেকে আমি যে একটা রদ্দিমার্কা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সারারাত কাটিয়ে উর্মার মতো একটা স্টেশনে নেমে গোরুর গাড়িতে বিশ ক্রোশ পাড়ি দেব তা কি তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব?

নাগেদের কাছারি বাড়িতে ভাল হোটেলের আরাম আশা করে যাইনি। একটু-আধটু অসুবিধে হলেও দিনগুলো তাই একরকম ভালই কাটছিল। আসল সমস্যাটা ছিল নিঃসঙ্গতা নিয়ে। কাছারি বাড়ির সরকার মশাই আর গ্রামের দু-চারজন নিষ্কর্মা কি চাকরি জীবনের শেষে অবসর নেওয়া মানুষ ছাড়া কথা বলবার কেউ নেই। আমি অবশ্য এ সমস্যার মীমাংসার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়ে গিয়েছিলাম। গিবনের রোমের অবনতি ও পতন কাহিনির দ্বিতীয় খণ্ডটি নিয়ে গেছলাম সঙ্গে করে। প্রথম খণ্ড বহুকাল আগে পড়া হলেও দ্বিতীয় খণ্ডটি খোলার সময় এতদিনে আর হয়নি। এক মাস অজ্ঞাতবাসে সেই কর্তব্যটাই সম্পাদন করে, একসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচা সেরে আসব এই ছিল সংকল্প।

কিন্তু মাসের অর্ধেক না কাটতেই সে সংকল্পে অমন বাগড়া পড়বে তা ভাবতে পারিনি।

প্রথম ক-দিন আমি সকাল বিকেল সারা গ্রামটা ঘুরে ফিরেছি। দেখবার কিছুই নেই, তবু যেখানে পুরো একটা মাস কাটাতে হবে সে জায়গাটা নেহাত অচেনাই বা কেন থাকবে।

হপ্তা দুই বাদে গিবন সাহেবের মান রাখবার জন্য সন্ধেবেলা কেরোসিনের টেবল ল্যাম্পটা জ্বেলে বইটি সবে খুলেছি এমন সময়ে সরকার মশাই ঘরে ঢুকেছেন।

সরকার মশাই মাঝবয়সি সাদাসিধে গেঁয়ো মানুষ। এমনিতেই একটু বেশি বিনয়ী। কিন্তু এদিন দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, মুখের ভাবে আর শেষ পর্যন্ত কথা বলার ধরনে কেমন যেন অত্যন্ত লজ্জিত অপরাধীর চেহারা ফুটে উঠেছে।

বই থেকে আমি মুখ তুলে তাকাবার পর বারকয়েক ঢোঁক গিলে তিনি প্রথমে শুধু থেমে থেমে বলেছেন, 'আজ্ঞে, একটু মুশকিল হয়েছে।'

'মুশকিল! কী মুশকিল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

'আজ্ঞে, আজ রাত্রে আপনার দুধ খাওয়া হবে না।'

সরকার মশাইয়ের অমন ট্র্যাজিক ভাবভঙ্গির পর সমস্যাটা মাত্র দুধের জেনে হেসে ফেলে বলেছি, 'তা না হলে আর কী করা যাবে!'

একটু থেমে সরকার মশাইকে সহজ হবার সুযোগ দেবার জন্যই তার পর জিজ্ঞাসা করেছি, 'তা দুধের হয়েছে কী? গয়লা এখনও দিয়ে যায়নি? কিন্তু সবে তো এখন সন্ধে। একটু দেখুন না, এখনও আসবার সময় তো আছে।'

'আজ্ঞে, গয়লা আজ আর আসবে না।'

'আসবে না মানে!' সরকার মশাইয়ের কথার ধরনে এবার গলাটা ঠিক মধুর রাখতে পারিনি, 'গয়লা কি তা-ই বলে পাঠিয়েছে?'

'আজ্ঞে, বলে পাঠাতে পারলে সে তো দুধই পাঠিয়ে দিত।'

অবাক হয়ে সরকার মশাইয়ের দিকে এবার চেয়েছি। এ আবার কী হেঁয়ালি করছেন সরকার মশাই। আমার সঙ্গে রসিকতার সম্পর্ক তো তাঁর নয়।

একটু রুক্ষ হয়েই বলেছি, 'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।'

খুলেই এবার বলেছেন সরকার মশাই। যা বলেছেন তাতে অবাক একটু হলেও উপভোগ করবার মতো মজাই পেয়েছি।

আমাদের আলাপ যা হয়েছে তার ধারাটা এইরকম—

'ভূতের ভয়েই আমাদের গয়লা নাকি আজ সন্ধের পর আর আসতে পারবে না,' জানিয়েছেন সরকার মশাই।

'এতদিন তো বেশ আসছিল। ভূতের ভয় হঠাৎ আজই হল কেন?' জিজ্ঞাসা করেছি আমি।

'কাল রাত্রেই সেই অশরীরীরা গ্রামে দেখা দিয়েছেন বলে।'

'তা যাঁরা দেখা দিয়েছেন তাঁরা যে ভূত তা বোঝা গেল কী করে? জ্যান্ত মানুষকেও তো ভূত বলে ভুল হতে পারে?'

'না, জ্যান্ত মানুষ নয়, ভূতই। ভূত ছাড়া গড়মাদারের ওই ধসে-পড়া আতঙ্ক পুরীতে জ্যান্ত মানুষ কারও যাবার ক্ষমতা কি সাহস হবে না।'

'আচ্ছা, ভূতই না হয় মানলাম, কিন্তু গড়মাদারে ভূত দেখা গেছে তো গাঁয়ের পথে হাঁটতে ভয় কীসের?'

'ভয়ের রীতিমতো কারণ আছে। গাঁয়ের লোক দশ বছর আগের কথাটা ভোলেনি। গড়মাদারে ভূতুড়ে কিছু দেখলেই কিছুদিন সন্ধের পর কেউ আর ঘরের বার হয় না।'

'কী হয়েছিল দশ বছর আগে?' জিজ্ঞাসা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সরকার মশাইয়ের কাছে যা জানবার জেনেছি। দশ বছর আগে কিছু ভূতুড়ে ব্যাপার দেখলেও প্রথমে কেউ সেটা খুব গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। ভূতুড়ে বাড়িতে ভূত দেখা যাবে এ আর আশ্চর্য কী! রাত্তিরে আলো

নড়াচড়া আর নানারকম আওয়াজ পাওয়ার মতো অমন দু-চারটে অদ্ভুত ভূতুড়ে ব্যাপার আগেও গড়মাদারে কেউ কেউ দেখেছে মাঝে মাঝে। সেবারে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হয়েছিল। গড়মাদারে ভূতুড়ে আলোটালো দেখা যাবার পরই একদিন সকালে ডাকাতে বিলের ধারে বেহুঁশ একটা মানুষকে রক্তে কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। লোকটা মরেনি, কিন্তু মাথায় চোট খেয়ে অবস্থা কাহিল। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে লোকটা ঝুমুরডির সম্পূর্ণ অচেনা!

বিলের ধার থেকে তুলে এনে একটু সেবাশুশ্রূষা করার পর লোকটার জ্ঞান ফিরেছে। তখন সে যা বলেছে তাতে সবাই তাজ্জব। কে তাকে কেন মেরেছে তা তো নয়ই, এমনকী কেমন করে এখানে সে এসেছে তা-ও সে জানে না। এ তল্লাটের লোক সে নয়। অনেক দূরের এক জায়গা থেকে কে যেন ভোজবাজিতে তাকে এখানে এনে মেরে বেহুঁশ করে রেখে গেছে।

কথাটা শুনতে আজগুবি, কিন্তু একেবারে অবিশ্বাসই বা করা যায় কী করে! এ তল্লাটের সম্পূর্ণ অজানা একটা লোক খামোকা এখানে মার খেয়ে অজ্ঞান হতেই বা আসবে কেন?

এরপর যা হয়েছে তা একেবারে অভাবিত। অদ্ভুত ব্যাপারটার কূলকিনারা না পেয়ে দিন কয়েক বাদে এঁদের একজন শেষ পর্যন্ত বেশ দূরের পুলিশ চৌকিতে গেছল খবরটা দিতে। তার ফিরে আসবার আগেই জখম লোকটা হঠাৎ একদিন উধাও। যেমন এনে ফেলেছিল তেমনই কে যেন ভোজবাজিতে তাকে হাওয়ায় দিয়েছে মিলিয়ে।

এই অন্তর্ধানে ঝুমুরডি গ্রাম একেবারে ভয়ে কাঠ। গড়মাদারের ভূত সম্বন্ধে সন্দেহের বাষ্পও সেই থেকে গেছে উবে। সেখানে ভূতুড়ে কিছু দেখা গেলে কিছুদিনের মতো সন্ধে হতে-না-হতেই সব দরজায় ডবল হুড়কো আঁটা হয়ে যায়। ভাগ্যের কথা এই যে এই ভূতুড়ে ব্যাপারটা যখন তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে বড় জোর বছরে একবার গড়মাদার কিছুদিনের জন্য সারা গাঁয়ের বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

মনে মনে হাসলেও সরকার মশাইয়ের সব কথা খুব গম্ভীর মুখেই শুনেছি। জিভের ডগায় এলেও কোনও প্রশ্নই করিনি।

মনের মধ্যে সংকল্পটা তখনই অবশ্য স্থির হয়ে গেছে।

সেই সংকল্পের ফল যা দাঁড়িয়েছে তাই দিয়েই এ কাহিনী শুরু।

হ্যাঁ, সত্যিই সে রাত্রে সরকার মশাই তাঁর কুঠুরিতে শুতে যাবার পর তাঁর নাক ডাকার শব্দে নিশ্চিন্ত হয়ে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

গাঁয়ের রাস্তা একেবারে অন্ধকার নয়। শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদের আলোর সঙ্গে ঝকঝকে আকাশের তারার ঝাঁকের ঝিকিমিকিতে পথঘাট বেশ চেনা যায়। সারা গাঁয়ের নিথর নিস্তব্ধতাটাই শুধু কেমন যেন গা ছমছম করিয়ে দেয়। আঁকাবাঁকা গাঁয়ের পথে গড়মাদারের দিকে যেতে যেতে একবার দূরে কোথায় ক-টা কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না। আমার যেন মনে হল সে ডাকও একবার উঠতে গিয়ে কীসে যেন চাপা পড়ে গেল।

অস্বস্তি একটু যে না হচ্ছিল তা নয়, কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করবার মতো মন নিয়ে বার হইনি। নির্জন নিস্তব্ধ গাঁয়ের পথে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে গড়মাদারের ধ্বংসস্তূপের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন সপ্তমীর চাঁদ অস্ত যেতে আর বাকি নেই। সামঞ্জস্যহীন সৌষ্ঠবহীন বিরাট ধ্বংসস্তূপটা সেই মরা চাঁদের রুগ্ন বিবর্ণ আলোয় যেন একটা ভয়াল নিষেধের মতো মজা বিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত মনটা প্রস্তুত করে নেবার জন্য সেখানে দাঁড়ালাম। দিনেরবেলা এদিক দিয়ে ঘুরে যাবার সময় এ ধ্বসংস্তূপের একমাত্র অধিবাসিনী বৃদ্ধ বিধবা মহিলা কোনদিকে কোথায় থাকেন তা দেখে গিয়েছি। সেদিকটা বাদ দিয়ে অন্যদিক দিয়ে গড়মাদারের ধ্বংসপুরী ভাল করে সন্ধান করব এই আমার সংকল্প। বাইরের পরিবেশ যতই ভয় জাগাবার অনুকূল হোক না কেন,

এ পুরীর ভূতুড়ে ব্যাপারটা যে কিছুটা মূঢ় কুসংস্কার জড়ানো কল্পনা, আর কিছুটা কোনও মতলববাজ দলের কারসাজি এ বিষয়ে তখন আমার কোনও সন্দেহ নেই। ভূতের ভয় দেখিয়ে নিশ্চয়ই ধূর্ত কোনও একটা দল এই গড়মাদারের ধ্বংসপুরীতে তাদের কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে। তাদের সেই কারসাজিই আমি ধরে ফেলতে চাই।

ভূতপ্রেত না হোক, দুষ্টু মানুষের শত্রুতার ভয় যে একেবারে করিনি এমন নয়। তবে এই নেহাত নগণ্য গ্রামের একটা পোড়ো ভিটেতে সত্যিকারের কোনও বাঘা বদমায়েশের দলের দেখা পাব বলেও মনে করিনি। কিছু পেলে নেহাত ছিঁচকে বদমায়েশদের গোপন নেশাভাঙের আড্ডা-ই খুঁজে পাব বলে ধরে নিয়েছি আর সেরকম দু-চারটেকে সামলাবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ জাগেনি।

ধারণাটা ওইরকম ছিল বলেই মনস্থির করে নিয়ে ধ্বংসপুরীর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে একটু বেশিরকম চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

দূরে ধ্বংসস্তূপের একটা ঢিবির ধারে অস্পষ্টভাবে যা চোখে পড়েছে, আমার ধারণার সঙ্গে তা ঠিক মেলে না।

দূরে যা দেখা যাচ্ছে তা আবছা হলেও সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে ঢাকা যে একটি নারীমূর্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভৌতিক প্রকাশ একটা কিছু দেখব বলে জানতাম, কিন্তু সেটা অন্যরকম আরও সাদাসিধে কিছু হবে বলে মনে করেছিলাম। মূলত চাষি গাঁয়ের গোপন নেশাভাঙের দলের কাছে এরকম নারীমূর্তি দেখাবার ফন্দি আশা করিনি।

একবার মনে হল এ পোড়ো ভিটের একমাত্র অধিবাসিনী সেই বিধবা বৃদ্ধাকেই দেখছি না তো! কিন্তু একেবারে উলটোদিকে তাঁর কুঠরি ছেড়ে তিনি এ প্রান্তে এমন সময়ে ওই ঢিবির ওপর উঠতে যাবেন কেন? তা ছাড়া যত অস্পষ্টই হোক, চেহারাটা তো কোনও বৃদ্ধার বলে মনে হয় না।

বৃদ্ধা যে নয় মূর্তিটা হঠাৎ সরে ভেতর দিকে যাওয়ার সঙ্গে নির্ভুলভাবেই বোঝা গেল। চলার ভঙ্গিতে বার্ধক্যের ছাপ তো নেই-ই, যুবতী হিসেবেও কেমন যেন তার মধ্যে একটু ছন্দের তফাত।

মূর্তিটা সরে যাবার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা আমি কিন্তু ভাবিনি। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দ আর দ্রুত পায়ে তখন আমি তাকে অনুসরণ করছি।

ওই বিশাল ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে গোপনে কাউকে অনুসরণ করা খুব সোজা ব্যাপার নয়। যে কোনও মুহূর্তে জানাজানি হয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনাই বেশি।

নেহাত ভাগ্যের জোরেই সে বিপদ আমার হয়নি বলে মনে করেছি। একটু করে ব্যবধান কমিয়ে মূর্তিটার বেশ কাছে পৌঁছবার পর মূর্তিটার চলাফেরা ধরনে কেউ যে তাকে অনুসরণ করছে তা সন্দেহ করেনি বলেই মনে হয়েছে। কোথাও একটু থেমে, কোথাও আবার যেন অকারণে একটু ঘুরে বেড়িয়ে মূর্তিটা যে ভাবে এগিয়ে গেছে তাতে তার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে দেরি হয়নি। সে উদ্দেশ্য হল এত রাত্রেও গাঁয়ের পথে এ তল্লাটে আসবার স্পর্ধা যদি কারও হয়ে থাকে তো তাকে ভয় দেখানো। সেই জন্যই এদিক ওদিক ঘুরে মূর্তিটা মাঝে মাঝে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বাইরে থেকে যেখানটা দেখা যায়।

এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়াবার সময়েই পেছন থেকে তাকে ধরব এই ছিল মতলব। কিন্তু মতলবটা অত সহজে সিদ্ধ হল না। আমার অত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও কী করে জানি না হঠাৎ এক সময়ে মূর্তিটা বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে মনে হল।

এরপর তার গতিবিধি গেল বদলে। আমি যেমন তাকে, সে-ও যেন তেমনই তার অদৃশ্য শত্রুকে ধরবার জন্য সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে এক ধরনের লুকোচুরি শুরু করে দিলে।

তা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কী ভাবে তাকে ধরেছি এবং ধরার ফল কী দাঁড়িয়েছে তা দু-বার বলবার দরকার নেই।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে উন্মাদের মতো গড়মাদারের ধ্বংসপুরী থেকে বেরিয়ে কত দূরে ছুটে যেতাম জানি না। কিন্তু সে ভগ্নস্তূপ থেকে বার হবার সময়েই একটা ঢিবির ওপরে বুনো লতায় পা জড়িয়ে পড়ে গেলাম।

সজোরে সেই পড়ে যাওয়াতেই আমার হুঁশ ফিরে এল। এ আমি করছি কী! একটু সামলে নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকালাম। শরীরের স্পর্শে যা টের পাচ্ছি সেই একটা গাঢ় ভিজে কিছুর ছোপ হাতে জামায় কাপড়ে লেগে রয়েছে। কিন্তু এ কি রক্ত?

এতক্ষণে খেয়াল হওয়ায় পকেট থেকে টর্চটা বার করে দেখলাম। রংটা লালই বটে, কিন্তু রক্ত এ তো নয়। রক্ত হলে এতক্ষণে তো জমতে শুরু করত।

জিনিসটা তা হলে কী? আর খানিক আগে যা ঘটেছে সে ব্যাপারটাই বা কী? নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে হাত-পায়ের বেশ একটু কাঁপুনি অনুভব করলেও দাঁতে দাঁত চেপে টর্চটা ধরে আবার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

এদিকে ওদিকে একটু খোঁজবার পর সঠিক জায়গাটা পেতে খুব দেরি হল না।

প্রথমেই সারা শরীরটা তখন অবশ্য শিউরে উঠেছে। ঠান্ডা নরম কী একটা রবারের মতো জিনিস পায়ে মাড়িয়ে ফেলেছি।

হৃদ্‌পিণ্ডটা একেবারে যেন লাফ দিয়ে উঠলেও কোনওরকমে নিজেকে সামলে জিনিসটা মেঝে থেকে এবার তুলে টর্চটা জ্বাললাম।

লাল গাঢ় ছোপ-লাগা সেই ছিঁড়ে খুলে আসা হাতটা।

পায়ের তলায় এইটেই রবারের মতো লেগেছিল। জিনিসটা নিপুণভাবে রবারেরই তৈরি— ফোম রবারের। পাশে একটু খোঁজার পর খড়ের তৈরি মূর্তিটাও পেলাম। একটা হাত কাটা অবস্থায় ঘরের কোণটায় কাত হয়ে পড়ে আছে। হাতটা সঙ্গে নিয়েই কাছারি বাড়িতে ফিরে এলাম। সরকার মশাইয়ের নাক ডাকা আর শোনা যাচ্ছে না। দু-বার বাইরে থেকে ডেকে ঘরেই গিয়ে ঢুকলাম। সরকার মশাই সেখানে নেই।

পরের দিন সকালে আমার টেবিলেই তাঁর চিঠিটা পেলাম। হঠাৎ বাড়িতে বিপদের খবর পেয়ে তাঁকে রাত্রেই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমার সেবার কোনও ত্রুটি যাতে না হয় সে ব্যবস্থা তিনি করে যাচ্ছেন। আমি যেন তাঁকে মাফ করি।

সেবাযত্নের ব্যবস্থা সত্যিই যে করেছেন সকালেই গয়লা আসায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

'কাল রাত্রে দুধ দাওনি কেন?' জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

'আজ্ঞে সরকার মশাই যে খবর দিয়ে পাঠালেন, দুধ রাত্রে লাগবে না বলে।'

চুপ করে শুনলাম। একটু বেলায় গ্রামের নতুন আলাপীরা এলে গড়মাদারের ভূতুড়ে কিংবদন্তির কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

তাঁরা শুনে অবাক। অনেককালের পোড়োবাড়ি হলে যা হয় সেই ভূতুড়ে বদনাম বাড়িটার থাকলেও সরকার মশাই আমায় যা বলেছেন সেরকম কোনও গল্প তাঁরা শোনেনইনি।

'কিন্তু কাল রাত্রে সমস্ত গ্রাম হঠাৎ অমন নির্জন নিস্তব্ধ ছিল কেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'নির্জন নিস্তব্ধ ছিল?' আলাপীরা হাসলেন। তার পর বুঝিয়ে দিলেন যে, নেহাত বেয়াড়া কিছু না ঘটলে ঝুমুরডির মতো গ্রাম প্রতি রাত্রেই অমনই নিস্তব্ধই থাকে। আমি এর আগে রাত্রে বার হইনি বলে জানতে পারিনি।

* * *

সোজা তার পরদিনই কলকাতায় ফিরে এলাম। ফিরে স্টেশন থেকেই ঝুমুরডির নাগের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠে সুবুদ্ধিটা মাথায় এল। নাগের কাছে তো নয়ই,

নিজের অফিসেও এখন যাবার দরকার নেই। বাজির মাস শেষ হতে আর কয়েকটা দিন বাকি আছে। সে ক-টা দিন কোনও হোটেলে অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দিলে ক্ষতি কিছু নেই। পরাশর কী করছে গোপনে সে খবরও নেওয়া যাবে।

বুদ্ধিটা যে ভালই মাথায় এসেছে, পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের একটা ছোটখাটো হোটেল থেকে পরাশরের বাড়িতে ফোন করেই তা বোঝা গেল। পরাশর বাড়িতে নেই, কলকাতাতেও না। আমি কলকাতা ছাড়ার দিনকয়েক বাদেই কোথায় যে গেছে আর কবে যে ফিরবে তার বাড়ির অনুচর কিছুই জানে না।

মনে মনে একটু হাসিই পেল। নাগেদের সরকার মশাইয়ের কাছে আমি নাকাল হয়েছি ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে ডবল হয়রানি পরাশরের এখন হচ্ছে না কি? নিজের গোয়েন্দাগিরির মান রাখতে হিল্লি দিল্লি কোথায় আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে কে জানে।

ঠিক একমাস পূর্ণ হবার পরদিন নিজের বাসায় ফিরে গেলাম।

পরাশর এখনও ফিরেছে কি না তার বাসায় খোঁজ করবার জন্য ফোনটা তুলতে গিয়ে নামিয়ে রাখতে হল। স্বয়ং পরাশরই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকছে।

কিন্তু তার হাতে ওটা কী?

হাতে যে কী পরাশর টেবিলের ধারে এসে বসে হাসিমুখে নিজেই জানিয়ে দিলে, 'তুমি পর পর চার হপ্তা ছাপাবে কথা দিয়েছিলে, তাই বাছাই করবার জন্য ক-টা বেশি কবিতাই এনেছি!'

'পর পর তোমার কবিতা ছাপব!' কটমটিয়ে পরাশরের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ বিমূঢ় বিহ্বল গলা দিয়ে আর স্বর বার হতেই চায় না।

'তু...তু...মি!' তারপর একটু সামলে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আমার ঠিকানা পেলে কী করে?'

সামান্য একটু খরচ করে। পরাশর তাচ্ছিল্য ভরে পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে আমায় হাতে দিয়ে বললে, 'এই যে, দেখো না।'

দেখলাম। খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনটা নিরুদ্দেশের। বেশি নয়, মাত্র গুটিকয়েক লাইন:

> খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র কয়েক দিন হইতে নিখোঁজ।
> কেহ তাঁহার সন্ধান জানিলে এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিয়া বাধিত করিবেন।

আমার পড়া শেষ হবার আগেই পরাশর বলে গেল, 'ও বিজ্ঞাপন বার হবার পরদিনই মিস্টার নাগ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর তাঁর একটু সাহায্য নিয়ে যা করবার করেছি। ওই ফোন নম্বরের হাতটা বানাতে যা একটু হাঙ্গামা হয়েছিল আর প্রথমে গিয়ে মিস্টার নাগের চিঠি থাকা সত্ত্বেও সরকার মশাইকে এ ষড়যন্ত্রে রাজি করাতে।'

'কিন্তু, কিন্তু,' গলাটা বৃথাই স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওই নারীমূর্তিটি কে?'

'কেন?' পরাশর একটু গর্বভরে জানালে, 'খুব খারাপ মানিয়েছিল? ছেলেবেলায় ফিমেল পার্ট করেছি যে! এখন মন দিয়ে শোনো ক-টা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি। নাগেরও দুটো আছে—'

'নাগেরও আছে? তা-ও আমায় ছাপতে হবে?'

'বাঃ, তা হবে না!' আমার আগুনের হলকার মতো বাচন গ্রাহ্যই না করে পরাশর জোর দিয়ে বললে, 'একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে!'

তুরুপের তাস চুরি

ঝকঝকে খটখটে
চলে গেছে দিনগুলো
এখন তো স্যাঁতসেঁতে
তা না হলে সপসপে
দিন আর রাত
তবু আছি প্রস্তুত
করব না খুঁতখুঁত
মেনে নেব যেমন বরাত।

কবিতাটায় চোখ বুলিয়েই কার লেখা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে। হ্যাঁ, এ অদ্ভুত কবিতা সেই এক এবং অদ্বিতীয় গোয়েন্দা-কবি পরাশর বর্মার।

আমার পত্রিকার জন্যে পাঠানো অনাজনের নানা লেখা ঘাঁটতে ঘাঁটতে তার এই মার্কা-মারা অপরূপ কাব্যসৃষ্টিটি পেয়ে লেখা বাছাই ছেড়ে তাকে একটা চিঠি লিখছিলাম।

লিখছিলাম, 'তোমার কবিতাটা পেয়েছি কিন্তু তোমার গনগনে কবিতা ছাপলে কাগজ ঝলসে যাবে কি না তাই ভাবছি। শেষ পর্যন্ত কবিতাটি হয়তো না ছেপে উঠতে পারব না, কিন্তু সেই সূত্রে তোমার সম্বন্ধে যা মনে হচ্ছে, তাই না লিখে পারছি না। বিলেতের রানির বাইরে কোথাও যাবার সময় রাস্তায় যদি তাঁর যাওয়ার ঘটা কখনও লক্ষ করে থাকো তা হলে অন্য সব সমারোহের উপকরণের সঙ্গে তাঁর বিরাট কালো লিমুজিনের সামনে ড্রাইভারের ঠিক পাশে বিশেষ একজনকে নিশ্চয়ই দেখেছ। লম্বা-চওড়া সুঠাম চেহারা, পোশাক একেবারে পুরোপুরি কেতাদুরস্ত, মাথায় বাউলার হ্যাটটি পর্যন্ত একেবারে যেন মেপে তৈরি করে বসানো। ব্রিটিশ মহারানি সরকারিভাবে কোথাও গেলে তো বটেই, নিজের শখ বা আনন্দের জন্যে যে-কোথাও গেলে এই বিশেষ মানুষটিকে একেবারে নিখুঁত পোশাকেআশাকে তাঁর কাছাকাছি এমন জায়গায় দেখা যাবে যেখানে রাজপরিবার বা ওইরকম সম্ভ্রান্তদের ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না। বিলেতের কয়েকটি অ্যাসকট-এর মতো ঘোড়দৌড়ের বড় বড় প্রতিযোগিতা যথার্থ রাজকীয় উৎসবের ব্যাপার, গ্র্যান্ড অপেরা যাকে বলে, সে রকম ধ্রুপদী নাট্যসংগীতানুষ্ঠানের আয়োজনও তাই। রানি মহোদয়ার উপস্থিতিতে সে-সব অনুষ্ঠান তার যথাযোগ্য মর্যাদা পায়। সে-সব অনুষ্ঠানেও রানি মহোদয়ার যথাসম্ভব কাছাকাছি নিখুঁত কেতাদুরস্ত পোশাক পরা এমন একজনকে দেখা যায়, যে রাজপরিবার বা কাছাকাছি সম্ভ্রান্ত কোনও খ্যাতিমান কেউ তো নয়ই, এমনকী সাধারণ পুলিশ-গোয়েন্দাও নয়।

তা হলে কী তিনি? কে তিনি? তিনি এ রকম বিশেষভাবে অনেক কিছুর তালিম নেওয়া গুণী মানুষ, যাঁর হাতের পিস্তলের টিপ শুধু অব্যর্থ নয়, যিনি তাঁর পোশাকের গুপ্তঘর থেকে নিমেষে সে-পিস্তল বার করে যথার্থ সন্দেহভাজনকে অব্যর্থভাবে চিনে লক্ষ্য করে নিজের অস্ত্রে তাকে অকর্মণ্য করে দিতে পারেন।

তাঁর খানদানি পোশাক এমন নিখুঁত যে, তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে গুপ্ত পিস্তল রাখার ব্যবস্থা করতে বিলেতের সবচেয়ে বড় ওয়েস্ট এন্ড-এর শাহানশা দরজিদেরও উপরি-বকশিশ দিতে হয়।

বিলেতের সবচেয়ে বড় খানদানি মহলের খবর যাতে থাকে সেই বিখ্যাত "বেলফাস্ট নিউজ লেটার্স" পত্রিকার ক-টা পুরনো কপিতে এই গোয়েন্দা কুলীনদের কথা পড়তে পড়তে তোমার কথা মনে হচ্ছিল। তোমার পিস্তল-বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্যের তুলনায় যা, অনেক বেশি না হোক, সমান দামি মুখ দেখে মানুষের মনের ভেতরটা রীতিমতো পড়ে ফেলায় তোমার সেই অসাধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে তুমিও লাখের মধ্যে এক। সুতরাং এই জাতের একটা কাজ পাওয়ার যোগ্যতমদের মধ্যে তুমি নিঃসন্দেহে একজন। আর এ-কাজ পেলে তোমার কী সুবিধেটা হত বলো দেখি। আর-কিছু না হোক, দিনে একটা কবিতা লিখতে তো পারতেই। আর তা না লিখলে নতুন ছন্দ মিল ভাব-ভাষার কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো করতে পারতে আশ—'

ব্যস, ওই পর্যন্ত লেখার পরেই কর্কশ স্বরে টেলিফোন বেজে উঠল। যন্ত্রটা কানে তুলে অবাক। আর কেউ নয়, স্বয়ং পরাশর বর্মাই ফোন করছে।

কিন্তু এ কী ধরনের ফোন করা।

তার গলাটা শুনে রীতিমতো খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছিলাম, 'আশ্চর্য ব্যাপার! শোনো, এ যেন টেলিপ্যাথিক রিমোট—'

কড়া গলায় বাধা দিয়ে, 'থাক, থাক! যা বলতে যাচ্ছিলাম, তাতে,' ওদিক থেকে পরাশর তার নিজের কথা হুকুমের মতো করে বলে গেল, 'মন দিয়ে কথাগুলো শোনো, তোমার কাছে এখনই একজনকে পাঠাচ্ছি। দেহের মাপটাপ প্রায় তোমারই সমান। তুমি তো আধা মির্জাপুরি খোট্টা, তোমার খোট্টাই কোর্তা-টোর্তা ওর গায়ে একেবারে বেমানান হবে না। ধুতি-জুতো ওর নিজেরই থাকবে। শুধু তোমার লঙ্‌কোটটা আর-একটা টুপি দেবে রাজা রাজেন্দ্রলাল-মার্কা। তুমি নিজে যেমন খুশি পোশাক আনতে পারো।'

'কিন্তু,' বলে একবার বাধা দেওয়ার চেষ্টায় কোনও লাভ হল না।

আমার বাধাটা আর-এক ধমকে বাতিল করে পরাশর বলে গেল, 'এখন সাতটা বেজেছে। যাকে পাঠাচ্ছি মিনিট পনেরোর মধ্যে সে তোমার ওখানে পৌঁছে যাবে। তুমি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নাও। একটা সুটকেসে টুথ-ব্রাশ, টুথ-পেস্টের সঙ্গে সেফটি রেজর আর ক-টা নেহাত দরকারি জামা-কাপড়ের সঙ্গে খোট্টাই লঙ্‌কোট এবং টুপি নিয়ে তোমার কোয়ার্টার্সের দরজায় তালাটালা দিয়ে নীচে এসে অপেক্ষা কোরো। আমি যাকে পাঠাচ্ছি, সে একটা সাদা অ্যামবাসাডরে যাচ্ছে। গাড়ির নম্বর তোমাকে দিচ্ছি না। দেবার দরকার নেই। নম্বর যাই হোক, গাড়িতে যে যাচ্ছে তাকে দেখলেই তোমার চেনবার কথা।

তবে, একটা বিশেষ কারণে যদি না চিনতে পারো, তাতেও ভাবনার কিছু নেই। গাড়ির বনেটের মাথায় একটা লাল-সবুজ ফ্ল্যাগ দেখলেই নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি তাতে উঠতে পারো। তোমার সুটকেস নিয়ে পিছনের সিটে যার পাশে বসবে, তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে লাভ নেই। কারণ ক্ষমতাই নেই তার কথা বলার।

গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভারকেও তোমায় কিছু বলতে হবে না। সেও কোনও কথা না বলে সোজা হাওড়া স্টেশনে তোমাদের পৌঁছে দেবে। স্টেশনে যাবার পথে গাড়ির ভেতর তুমি তোমার সঙ্গে আনা খোট্টাই কোট আর টুপি তোমার সঙ্গীকে পরতে দিয়ে তার ছাড়া-পাঞ্জাবিটা তোমার সুটকেসে ভরে নেবে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর ন-নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে গেলেই আমার দেখা পাবে। তোমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলবে না। শুধু নীরবে আমার পিছু-পিছু গেলেই আমি তোমাদের ঠিক ট্রেনের ঠিক কামরায়, তোমাদের নাম-লেখানো বার্থে পৌঁছে দেব।

সেখানে তোমার ঠিক নামই থাকবে। আর তোমার সঙ্গীর নাম থাকবে মোহনলাল বলে। গাড়িটা হল দেরাদুন এক্সপ্রেস আর কামরাটা হল একটা থ্রি-টিয়ার সেকেন্ড ক্লাস স্লিপার। সেখানে তোমাদের সঙ্গে আমার নামটাও পাবে, তবে সেটা পরাশর না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে। নাম যাই হোক, আমি কোনও ছদ্মবেশ না নিয়ে এই চেহারাতেই থাকব। সুতরাং সেদিক দিয়ে ভাবনার কিছু নেই।

এসব ব্যাপারের মূল রহস্য যে কী, এখন কিছু বলছি না। আশা করছি হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার আগেই তা তোমাকে জানাতে পারব।'

ঠিকই তা পেরেছিল পরাশর। হাওড়া স্টেশনে সাদা অ্যামবাসাডর গাড়িতে যথাব্যবস্থা পৌঁছবার পর ন-নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটেই পরাশরের দেখা পেয়েছিলাম। কেউ কারও সঙ্গে কথা না বললেও তার চিঠিতে জানানো নির্দেশমতো নীরবে আমার সঙ্গীর সঙ্গে তাকে প্ল্যাটফর্মের ভেতর অনুসরণ করে গেছলাম।

আমার খোট্টাই কোট আর মাথার টুপি-পরা সঙ্গীটি কিছুটা দূর থেকে আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছিল। আমার বাসা থেকে সাদা অ্যামবাসাডর গাড়িতে আসার পর, গাড়ির ভেতরের অন্ধকারে তো নয়ই, তারপর স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মের আলোয় এসে পড়বার পরেও তাকে বিন্দুমাত্র চেনা বলে আমার কিন্তু মনে হয়নি।

না হওয়ার প্রধান কারণ বোধহয় তার মুখের ডান ধারের গাল আর চিবুকের ওপরকার ফোলা সাদা ব্যাণ্ডেজটা। ডান গালের ওপরে বা চোয়ালের নীচে কোনও দাঁতের গোড়ায় বেশ বেয়াড়া ঘা-টা হবার দরুন এ ব্যান্ডেজ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেহারার আদলই গেছে ঢাকা পড়ে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তখন আমাদের এক্সপ্রেস গাড়ি যাকে বলে ইন করে দাঁড়িয়ে। প্যাসেঞ্জারের ভিড়ের মধ্যে একদলের সঙ্গী হলেও যেন আলাদা আলাদা ভাবে এগিয়ে আমাদের বরাদ্দ করা থ্রি-টিয়ার কামরা খুঁজে বার করছি। পরাশর আমাদের আগেই সেখানে গিয়ে আরও অনেক যাত্রীর সঙ্গে দরজায় টাঙানো রিজার্ভ-করা বার্থের তালিকা দেখছে। ওই ভিড়ের ভেতরেই তাকে চার্টের বার্থ নম্বর জানবার ব্যস্ততার ছলে কায়দা করে আমার সঙ্গীর ঝোলা খোট্টাই জামার পকেটে একটা কাগজের মোড়ক ফেলে দেওয়ার ইঙ্গিত পেলাম।

পরাশর চার্ট দেখবার পর কামরার ভেতরে ঢুকে নিজেদের বার্থ খুঁজে বার করার সময় বুঝলাম সেগুলো বেশ বুঝেসুঝেই নেওয়া হয়েছে।

মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা খোট্টাই কোট-পরা আমার সঙ্গীর বার্থ যে-থাকের একেবারে ওপরে, তার একেবারে নীচের বার্থটি আমার। অর্থাৎ আমি নীচে থেকে যতক্ষণ ইচ্ছে তার বার্থের উপর নজর রাখতে পারব। শুধু তাকেই নয়, আমার নীচের বার্থ থেকে আমাদের বিপরীত দিকের থাকের সবচেয়ে উপরের বার্থের দিকেও আমি চোখ রেখে মুখে কিছু না বলেও ইশারা চালাচালি করতে পারি। বিপরীত দিকের সবচেয়ে উপরের থাকের বার্থটি পরাশরের।

কামরায় ঢুকে নিজেদের বার্থ চিনে নেবার পর পরাশরের ইঙ্গিতে তার পিছু-পিছু আমার সুটকেসটি নিয়েই আমি প্ল্যাটফর্মে আবার নেমে পড়লাম। বর্তমানে মোহনলাল নামের আমার সঙ্গী গাড়ির কামরাতেই থেকে গেল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, নিজের বার্থটি খুঁজে পেয়ে সে যত তাড়াতাড়ি পারে এখন থেকেই শোবার ব্যবস্থা করছে।

ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে কিছু দূরের একটা বুক স্টলে পরাশরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে দূর থেকে ইশারা করায় তার কাছে না গিয়ে সোজা প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার গেটের দিকেই এগিয়ে গেলাম।

পরাশরের এ-ইঙ্গিতের মানেটা খানিক বাদেই পেছন থেকে হনহন করে এসে তার আমাকে পেরিয়ে ঢোকবার গেটের দিকে যাওয়াতেই বোঝা গেল।

এ প্ল্যাটফর্মে কোথাও নয়, তার বাইরে স্টেশনের অন্য কোথাও নির্জনে পরাশর আমাকে যা বলার বলতে চায়।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে নির্জন বলতে নিরামিষ রেস্তোরাঁতে সে সুযোগ মিলল। ট্রেন ছাড়তে তখনও বেশ দেরি আছে। রেস্তোরাঁর এক নির্জন কোণে বসে শুধুমাত্র চা-টোস্টের অর্ডার দিয়ে পরাশর সমস্ত ব্যাপারটাই আমায় সবিস্তারে জানাল। বলতে আরম্ভ করার সময়েই সে প্রথম আমায় যা জিজ্ঞেস করেছিল তাতে আমি সত্যি অবাক হয়েছি।

সমস্ত ব্যাপারটার মূল রহস্য কী নিয়ে, পরাশর জিজ্ঞেস করেছিল প্রথমেই, 'তা কি তুমি সত্যি কিছুই বুঝতে পারোনি?'

অবাক ও একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে জবাব দিয়েছিলাম, 'না, সত্যিই পারিনি। পারবার কি কোনও ক্লু—যাকে বলে হদিস—আছে?'

'আছে বলেই তো মনে করি,' পরাশর একটু হেসে বলেছিল, 'গাড়িটা তোমায় আনতে গেল, সেটা ভাল করে লক্ষ করলেই বুঝতে পারতে না কি?'

'সেটা—মানে গাড়িটা ভাল করে লক্ষ করলে?' একটু অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর প্রায় নিজের গাল চাপড়ে বলে উঠেছি, 'গাড়িটা...মানে গাড়ির বনেটের ফ্ল্যাগটার কথা বলছ? আরে ছি, ছি, সত্যি ওটার মধ্যেই যে সব মানে বোঝানো আছে সেইটেই আমি খেয়াল করিনি। লাল-সবুজ! তা হলে লাল-সবুজই সবকিছুর মূলে?'

'হ্যাঁ, তা-ই,' বলে পরাশর এবার সমস্ত ব্যাপারটার যে বিবরণ শুনিয়েছে, সংক্ষেপে তাই জানাচ্ছি।

লাল-সবুজ বলতে গত পাঁচ বছর ধরে যাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে সমস্ত দেশের লোক মশগুল, সেই খেলুড়ে-ক্লাবের ইউনিফর্ম বা জার্সির রঙ বোঝায়, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

এই লাল-সবুজ ছোপ-মারা দলের ভাগ্য নিয়ে মাতামাতির ভাল দিক যেমন আছে, তেমনই খারাপও। এক জাতের জুয়াড়ি-চক্র লাল-সবুজ দলের প্রত্যেকটি খেলা নিয়ে তো বটেই, সারা দেশের বড়-বড় সব ক-টি লিগ ও শিল্ডের মতো প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ ফলাফল নিয়েও জুয়ার বাজির ব্যবস্থা করে, আকাশ-ছোঁয়া লাভের লোভ দেখানো পুরস্কার ঘোষণা করে।

এ সব জুয়াই অবশ্য গোপন, বেআইনি ব্যাপার। কিন্তু অসাধু ধনকুবের আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের শয়তানি কৌশলে এ পাপের ব্যবসা ডালপালা মেলে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এ জুয়ার কারবারে সবচেয়ে হালে নাম হয়েছে লাল-সবুজের খেলার ফলাফল নিয়ে। লাল-সবুজ দল এ-বছরের টানা ক-টি প্রতিযোগিতায় এ পর্যন্ত যত গোল করেছে তা আগেকার রেকর্ডের সমান। আর একটি মাত্র গোল করলেই তারা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। গোল তাদের মাত্র একটা দরকার, অথচ খেলা বাকি আছে এখনও দুটো। সুতরাং তাদের রেকর্ড-ভাঙা গোল করা সম্বন্ধে কারও কোথাও কোনও সন্দেহ নেই। এ রেকর্ড ভাঙা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ হল, লাল-সবুজ ফ্ল্যাগ লাগানো সাদা অ্যামবাসাডরে চোয়ালে ব্যান্ডেজ বাঁধা মোহনলাল নামে যে ছোকরাটিকে আমরা খানিক আগে রেলের থ্রি-টিয়ার কামরায় ওপরের বঙ্কে রেখে এসেছি, সে-ই।

মোহনলাল অবশ্য তার আসল নাম নয়। তার নাম আর কীর্তির কথা এখনকার ছেলে-বুড়ো কাউকে বলারও দরকার নিশ্চয়ই নেই। দুপায়ে বল নিয়ে অসাধারণ কেরামতি করবার ক্ষমতার গুণে সে গত দুবছরেই ভারতে তো বটেই, তার বাইরেও নানাদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। তাকে ইতিমধ্যে 'ইন্দ-মারাদোনা' অর্থাৎ 'ভারতের মারাদোনা' বলা হয়। এই মারাদোনা এ পর্যন্ত প্রতি

খেলায় গড়পড়তা নির্ঘাত দুটি করে গোল দিয়ে এসেছে। এ বছরের বাজি-ধরা খেলায় লাল-সবুজের মোক্ষম জয়ের জন্যে একটি মাত্র গোল আর দরকার। অথচ খেলা বাকি এখনও দুটি। এই দুটি খেলায় ইন্দ-মারাদোনা আর-একটা গোলও দিতে পারবে না?

জুয়া খেলে লাভের লোভে। যারা নিত্য নিজেদের সর্বনাশ করছে সেরকম সাধারণ জুয়াড়িরা মোটা লাভ করবার নিশ্চিন্ত আশায় একদিকে যেমন নাচছে, জুয়ার জগতের ঘুঘু মালিকরা তেমনই নিজেদের সর্বনাশ ঠেকাতে মরিয়া হয়ে এক শেষ উপায়ের কথা ভেবেছে। লাল-সবুজের শেষ দুটি খেলায় ইন্দ-মারাদোনা খেলতে নামার সুযোগ পেলে, নেহাত তাকে খুন না করে ফেললে, একটা অন্তত গোল ঠিক দেবেই। জুয়ার জগতের শাহানশাহকে তা হলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লোকসান দিতে হবে। খুন-জখমের অনেক ঝামেলা, তা ছাড়া সে সর্বনাশ ঠেকাবার একমাত্র যা উপায়, তারই ব্যবস্থা তাই করছে জুয়া-রাজ্যের শাহানশাহ। ইন্দ-মারাদোনাকে চুরি করবার ব্যবস্থা করেছে। শেষ খেলার দুটো দিন ইন্দ-মারাদোনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারলে খুন-টুন আর জখম-টখমের ঝামেলা এড়িয়ে বুদ্ধির প্যাঁচে লাল-সবুজের গোল করা একেবারে বন্ধ রাখা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া জুয়ার বাজিটা আছে মারাদোনার গোল করার ওপর। সে-ই যদি মাঠে না নামে, তা হলে রেকর্ড ভাঙবার গোল অন্য কেউ দিলে তা গ্রাহ্য হবে না।

পরাশর বলল, 'এইসব প্যাঁচ কষে লাল-সবুজ দলের মাথার মানিককে চুরি করবার যে মতলব জুয়াড়ি দল করছে, আগে থাকতেই নিজেরা ইন্দ-মারাদোনাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আমরা তা ভেস্তে দিচ্ছি। আমাদের সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। সারা রাত ওপরের বাঙ্কের সওয়ারির ওপর নজর রেখো। রিজার্ভ করা কামরায় ও কামরায় দু রাত কাটিয়ে সেই হরিদ্বারে গিয়ে নামবার পর আর কোনও ভাবনা নেই। এই রাস্তাটুকু শুধু আমাদের ইন্দ-মারা—থুড়ি এখানকার মোহনলালের ওপর আগাগোড়া নজর রেখো।'

পরাশরের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানবার পর আবার ট্রেনে নিজেদের কামরায় গিয়ে উঠেছি। আমাদের মোহনলাল তখন মাথায় টুপির সঙ্গে গায়ের কোট-টাই ভাঁজ করে বালিশের মতো মাথায় দিয়ে তার বাঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই রিজার্ভ করা কামরায় গোনাগুনতি যাত্রীর মধ্যে তার ওপর নজর রাখাটা সত্যিই এমন কিছু শক্ত হয়নি। শুধু যাওয়ার পথে বিহারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে প্রথম রাত্রে। রেলের আইনকানুন, আর যেখানই খাটুক, বিহারে খাটে না। এক্সপ্রেস ট্রেন বড়-বড় স্টেশনে ছাড়া থামে না। কিন্তু যেখানে থামে সেখানে প্যাসেঞ্জার গাড়ির অধম। পিলপিল করে বেপরোয়া যাত্রীরা রিজার্ভ-করা কামরার ভেতরে ঢুকে প্রথমে আমাদের বার্থের ওপরেই অম্লানবদনে ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিয়ে তারপর মেঝে পর্যন্ত দখল করে বসে যায়। ট্রেনের কোনও অফিসারকে বলার উপায় নেই, কারণ তাঁরা তখন কামরায় তো নয়ই, এ-ট্রেনের কোথাও আছেন কি না সন্দেহ। এইসব জ্বালার মধ্যে আমাদের মোহনলালকে তার ওপরের বার্থ থেকে নামার উপক্রম করতে দেখে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। তবে অন্য দিকের ওপরের বাঙ্কে পরাশরকে শুয়ে শুয়েই এ দিকে চোখ রাখতে দেখে সে অস্বস্তিটা কাটল।

আমাদের মোহনলাল বেচারাকে বেশ কষ্ট করেই ওপরের বার্থ থেকে নেমে কামরার মেঝে ও তার পাশের প্যাসেজময় বসে-থাকা যাত্রীদের ভেতর দিয়ে কোনওরকমে পথ করে এক প্রান্তের বাথরুমের দিকে যেতে দেখলাম। ট্রেনটা ঠিক কোন স্টেশনে থেমেছে বুঝতে পারিনি, তবে শেষ রাত্রে এ দিকটায় বেশ ঠান্ডাই পড়েছে। আমাদের মোহনলাল নামবার সময় গায়ের খোট্টাই কোটটা পরে নেমে ভালই করেছে বুঝলাম।

কিন্তু বেচারার অত কষ্ট করে বাথরুম যাওয়া নিষ্ফল হওয়া খুব খারাপ লাগল। নীচের বার্থে প্যাসেজের দিকে মাথা করেই শুয়ে ছিলাম। সেখান থেকে বাথরুমে যাবার বাঁকটা পর্যন্ত বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। বেশ খানিক বাদে যেরকম করুণ, কাতরভাবে সেদিক থেকে ভিড়ের ভেতর

দিয়ে পথ করে আসতে আসতে মোহনলাল আমার দিকে চেয়ে হতাশার ভঙ্গি করল, তাতে বুঝলাম ঢুকতে পেরে থাকুক বা না থাকুক, বাথরুমের অভিজ্ঞতাটা তার খুব প্রীতিকর হয়নি।

আমাদের মোহনলাল এলে তার বার্থে উঠে শোবার পর যতখানি সম্ভব সারারাত জেগেই কাটিয়েছি।

অন্তত একটা জলজ্যান্ত মানুষ চুরির ঘটনা আমার অজান্তে ঘটে যেতে পারে, এমন বেহুঁশ কখনও হইনি।

কিন্তু ভোর হওয়ার পর সেই ঘটনার কথা জানতে পারলাম। মোগলসরাই স্টেশনে তখন গাড়ি থেমেছে। সিট ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে চা-অলাকে ডাকব কি না ভাবছি, এমন সময় ওপর থেকে দুটো ঝুলন্ত পা নামতে দেখে আমাদের মোহনলাল নামছে বলে বুঝলাম।

কিন্তু পরমুহূর্তে ঝুলন্ত পায়ের পরে গোটা মানুষটা ওপর থেকে নীচে নামার পর একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

মোহনলাল? কোথায় গেল মোহনলাল? এখন ওপর থেকে যে নামল, সে কে?

সন্দেহে বিস্ময়ে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে অন্য দিকের ওপরের বাঙ্কে পরাশরের দিকে চাইলাম। সেও তার নিজের বাঙ্কে উঠে কেমন যেন গুম হয়ে লোকটির দিকে চেয়ে আছেন।

কে এই লোকটি? কোথা থেকে এল? আমাদের মোহনলাল তা হলে কোথায়?

সেই কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তবে তার আগেই আমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টির একাগ্রতাটা লক্ষ করে সে নিজে থেকেই বললে, 'ক্যা হুয়া, বাবুজি! কুছু কোথাও গড়বড় হল কি?'

'না, না,' আমি কী বলব ঠিক করতে না পেরে একটু অপ্রস্তুতভাবে বললাম, 'আপনি—মানে আপনি কখন এ কামরায় এলেন, আর, মানে ওই বাঙ্কটায় জায়গা পেলেন কী করে?'

ভদ্রলোক আমার কথায় একটু কৌতুক বোধ করে বললেন, 'কেমোন করিয়ে আবার, যেমোন করে খালি বার্থ লিতে হয়, তেমনই করে। পিছলি স্টিশনে গাড়িতে উঠলাম, এ-কামরা দিয়ে যেতে এ-বার্থ দেখলাম, আর উঠে পড়লাম।'

'মানে—মানে—' একটু উত্তেজিত ভাবেই এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ও বার্থ আপনি খালি দেখলেন? ওখানে কেউ ছিল না?'

'ঝুটমুট গরম হচ্ছেন কেন বাবু?' লোকটি এবার একটু অপ্রসন্ন সুরে বলল, 'খালি না হলে আমি উখানে উঠি কী করে। আমার উখানে আর কার থাকার কথা আপনি বলছেন? কে ছিল উখানে?'

বেশ গরম গলাতেই হয়তো এ-প্রশ্নের উত্তর দিতাম, কিন্তু পরাশর তখন ওপর থেকে নীচে নেমেছে। তার অত্যন্ত গম্ভীর মুখে কেমন যেন একটা গুম মেরে যাওয়া ভাব। সে-ই যেন পাথর হয়ে মুখ-চোখের সামান্য একটু ইশারায় আমায় থামবার কথা জানিয়ে তারপর ট্রেন থেকে নামায় তৎপর হয়ে ওঠায় আমি বাধ্য হয়ে চুপ করে গেলাম।

নেমেছিলাম মোগলসারই স্টেশনে। স্টেশনে নেমে এক ফিরতি গাড়িতে কলকাতায় আসার আগে পরাশর লাল-সবুজের ক্লাব-অফিসে একটা দু কথায় টেলিগ্রাম করে দিল। 'ট্রাম্প-কার্ড স্টোলেন'। অর্থাৎ 'তুরুপের তাস চুরি গেছে।'

এরপর খবরের কাগজে ইন্দ-মারাদোনার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে বেশ কিছু হইচই অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু রহস্যের কোনও হদিস কোথাও মেলেনি।

লাল-সবুজ দলের দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি অবশ্য ছিল না। আমাদের ব্যর্থ অভিযান থেকে ফেরার দু-দিন পরে পরাশরের বাসায় গিয়ে জেনেছিলাম, সে কী একটা বিশেষ তল্লাশিতে আগের দিনই কলকাতা ছেড়ে গেছে।

কলকাতা ছেড়ে গেছে কোথায়, জিজ্ঞেস করে যা শুনলাম তাতে একেবারে অবাক। সে গেছে নাকি ডিব্রুগড়ে!

গেছে ডিব্রুগড়ে। আমাদের মোহর হারাল পশ্চিমের উঠোনে, আর আমরা তা খুঁজতে যাচ্ছি উত্তরের চিলেকোঠার ছাদে।

খোঁজা নয়, হয়তো নিজের কাজে হার মানবার দুঃখ ভুলবার জন্যে। এ একরকম আত্ম-নির্বাসন বলেই মনে হয়েছিল আমার।

এর পর পরাশরের আর কোনও খবর পাইনি। চেষ্টাও করিনি নেবার।

তারপর সেই ঐতিহাসিক দিন এল।

লাল-সবুজের প্রথম বড় প্রতিযোগিতার খেলা চেপে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ইন্দ-মারাদোনার নিখোঁজ হওয়ার খবরটা তখন খেলার জগতে কোথাও কারও জানতে বাকি নেই।

সল্টলেকের স্টেডিয়াম প্রায় খালিই থাকবে মনে হচ্ছে।

লাল-সবুজ গোলের রেকর্ড ভেঙে দেবে বলে অনেক আশায় অনেকে নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত বাজি ধরেছিল। কোনও আশাই আর নেই জেনে অনেকেই মাঠের ধারে কাছে ঘেঁসেনি। যারা এসেছে, তারাও যেন শোকসভায় এসেছে, এমন তাদের মুখের চেহারা।

নির্ধারিত খেলা তবু যথাসময়ে আরম্ভ হবার ব্যবস্থা হল। বড় খেলার গোড়ায় যা-যা হয়, সবই হল ঠিকঠাক। রেফারি-লাইন্সম্যানরা এলেন। নামল বিপক্ষ দল। এবার লাল-সবুজের পালা। তারা একে-একে নামছে। যেন মাঠের মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, এমনই তাদের ভেঙে পড়া অবস্থা আর চেহারা। এক, দুই, তিন করে নয়—দশ—

তারপর ও কী—আকাশ ফাটা উল্লাসের ধ্বনি সমস্ত মাঠময়!

কেন এই উল্লাসধ্বনি! কেন আর? সবশেষে যে নামছে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং এক ও অদ্বিতীয় সেই ইন্দ-মারাদোনা। তাকে মাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল, আর কেউ নয়, পরাশর।

হ্যাঁ, পরাশর সেবার তার সত্যিকার বাহাদুরি দেখিয়েছিল ইন্দ-মারাদোনাকে চোরেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে।

কেমন করে বাঁচিয়েছিল? বাঁচিয়েছিল নিজেই তাকে চুরি করার ব্যবস্থা করে।

বড় বাটপাড়কে হারাবার জন্যই তাকে নিজের জিনিস চুরি করে রাখতে হয়েছে আগে থেকে।

চুরি করল কখন? কী করে?

চুরি করেছে বিহারের বড় স্টেশনে গাড়ি থামার পরে মোহনলাল-সাজা আসল ইন্দ-মারাদোনার বাথরুম যাবার ছলে খালি চোখের আড়াল হয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাবার কৌশলে। সে নেমে আবার ব্যবস্থামতো কলকাতায় ফিরে গেছে, আর তার জায়গায় খোট্টাই কোট, টুপি আর মুখের ব্যান্ডেজ সমেত ইন্দ-মারাদোনার মাপেরই আগে থাকতে তৈরি করা আর-একজন ভেতরে ঢুকে খালি বার্থটায় যখন উঠে শুয়েছে তখন কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারেনি।

এরপর ট্রেন চলবার সময়েই জাল মোহনলাল তার মুখের ব্যান্ডেজ আর মাথার টুপি ইত্যাদি খুলে অন্য মানুষ হয়ে গেছে, আর মোগলসরাই স্টেশনে তাকে দেখে যেন দুঃখে লজ্জায় স্টেশনে নেমে ক্লাব অফিসে মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে।

তার নির্দেশমতো এর আগেই মোগলসরাই স্টেশন থেকে আসল ইন্দ-মারাদোনা কলকাতা আর তারপর ডিব্রুগড়ে আত্মগোপন করে থেকে। পরাশর নিজেও তারপর যেন হার মানার দুঃখে সেখানে গিয়ে ওকে পাহারা দিয়ে ঠিক দিনে ঠিক সময়ে খেলার মাঠে এনে হাজির করেছে।

হ্যাঁ, তারপর খেলার কী হয়েছে?

হয়েছে যা, তা সোনার হরফে লিখে রাখার মতো।

ইন্দ-মারাদোনা, তাকে চুরি যারা করতে চেয়েছিল তাদের শিক্ষা দিতে, একটা-দুটো নয়, পরপর তিনটে গোল দিয়ে হ্যাটট্রিক করে সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছে। আর জুয়ার রাজ্যের শাহানশাহেরা রীতিমতো একটা ঘাড় মটকানো রদ্দা খেয়ে কিছুদিনের জন্য অন্তত যে-যার গর্তে গিয়ে লুকিয়েছে।

পরাশরের শর

গাড়িটা একটু লেট যাচ্ছে।

বেশি নয়, সামান্য পাঁচ-দশ মিনিট। লাসালগাঁও ছেড়েছে রাত দুটো বাইশে।

আরও মিনিট দশেক আগে ছাড়বার কথা।

তবে এটুকু দেরি ধর্তব্যই নয়! কিছু পরের মধ্যেই এটুকু অনায়াসে মেক-আপ করে নেবে। স্পিড যতদূর তোলবার ইতিমধ্যেই প্রায় তুলে ফেলেছে।

অন্ধকারে একটা টিমটিমে আলোর ছোট স্টেশন ঝড়ের মতো পার হয়ে গেল।

স্টেশনটা উগাওন নিশ্চয়ই।

সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে একটা যেন বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল চৌধুরির। এ রকম একটা ব্যাপারের মোকাবিলা জীবনে এই প্রথম নয়। অনেকবারই এ ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

তবু এবারে যে ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আগেকার সব কিছু থেকে তা যে আলাদা জাতের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চাকার আওয়াজের ক্ষণিক পরিবর্তনের সঙ্গে ছোট স্টেশনটা একটু চমক দিয়ে দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরই মাথার ভেতরকার অ্যালার্ম ঘড়িটা যেন বেজে উঠে সজাগ করে দিল।

এবার তৈরি হও। এরপর চারটে স্টেশনে গাড়ি আর ধরবে না। অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটানা দৌড়।

সে দৌড়ে নিফাদ আর অদ্ভুত নামের কাসবে সুকেনে স্টেশন দুটো পার হবার পরই—

চৌধুরি কামরাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

ঘুমোবার নীল আলোর বালবটা ছাড়া আর সবই নেভানো।

তার নিজের বার্থের রিডিং লাইটটাও সে খানিক আগে নিভিয়ে দিয়েছে।

তা দিক। চোখটা অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার দরুন এই নীল আলোতেই বেশ দেখতে পাচ্ছে।

চার বার্থের কামরা। ইঞ্জিন-মুখো নীচের বার্থটা তার। নীচের অন্য বার্থটায় একজন ইউরোপিয়ান মহিলা ঘুমের মধ্যে গায়ের কম্বল ফেলে বেশ অসম্বৃত ভাবে শুয়ে আছেন।

মহিলার ঠিক ওপরের বার্থে তাঁর স্বামীও গভীর ঘুমে অচেতন। তিনি উবুড় হয়ে শুয়ে আছেন। ওপরের বাঙ্ক থেকে তাঁর বাঁ হাতটা নীচে ঝুলে পড়েছে।

ঘরের মৃদু নীল আলোতেও সে লোমশ হাতটা বেশ দেখা যাচ্ছে। লোমশ বেশ সবল সুপুষ্ট হাত। তাতে যে রিস্টওয়াচটি বাঁধা তার অতি চ্যাপটা গড়ন থেকে সেটা নেহাত সস্তা জিনিস নয় বলেই মনে হয়।

হাতটির মধ্যে সব চেয়ে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সে তার রঙ।

রঙটি রীতিমতো কালো। রিস্টওয়াচের চামড়ার ব্যান্ডটা তাতে যেন ফিকে হিসেবে বেমানান। নীচের বার্থের মহিলা খাঁটি পাশ্চাত্য মহিলা কি না চৌধুরি ঠিক জানে না। কামরাটায় গায়ে লাগানো রিজার্ভেশন কামরার নোটিসটা থেকে দম্পতীর নাম মিস্টার ও মিসেস হাটন বলে জেনেছিল।

হাটন নাম হলেই অবশ্য ইউরোপীয় হয় না। তা হন বা না হন ভদ্রমহিলার রীতিমতো সোনালি চুল, নীল চোখ, ফিকে গোলাপি রঙের ব্লন্ড। চুলটা আজকালকার কায়দায় যদিবা ছোপানো হয়, চোখের তারা আর গায়ের রং নিশ্চয় তা নয়।

ভদ্রমহিলা যেমন একেবারে বিশুদ্ধ ব্লন্ড, ভদ্রলোক চেহারায় তেমনই তার বিপরীত। চোখমুখের গড়নে অমন সুপুরুষ না হলে তাঁকে কাফ্রিই ভাবা যেত। কিন্তু নাক চোখ মুখ সত্যিই যেন কষ্টি পাথরে খোদা মূর্তি । তাই তাঁকে ভারতীয় শুধু নয়, দক্ষিণ ভারতীয় বলেই চৌধুরি ধরে নিয়েছিল।

চৌধুরি নিজে গাড়িতে উঠেছিল জলগাঁওয়ে। রিজার্ভেশন স্লিপে তখনই সব-কটা নাম পড়ে নিয়েছিল। নিজের নামটা ভুল লেখা দেখে মজাও পেয়েছিল একটু। মি. ও মিসেস হাটন আর তার নিজের নাম বাদে আর কোনও নাম তখন অবশ্য সে স্লিপে ছিল না। তার ঠিক ওপরের চতুর্থ বাঙ্কটি তখনও খালিই ছিল।

সে বার্থের যাত্রী এসেছিল পাচোরা-তে রাত দশটার পর। আধময়লা শার্ট-প্যান্টের অবস্থা আর সঙ্গের তোবড়ানো রংচটা কার্ডবোর্ডের তোরঙ্গটা দেখে লোকটাকে ঠিক প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওঠার উপযুক্ত বলে মনে হয়নি। একমাথা এলোমেলো রুক্ষ চুল আর রোগাটে মুখে অন্তত দুদিনের না-কামানো দাড়ি দেখে সে ধারণাটা আরও দৃঢ়ই হয়েছিল।

লোকটা বোধহয় ট্রেনে আর কোথাও জায়গা না পেয়ে রাতটা একটু শুয়ে কাটাবার প্রয়োজনে নিরুপায় হয়ে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটটা চোখ কান বুজে কিনে ফেলেছে।

টিনের ট্রাঙ্কটা ঠেলে ঠুলে সিটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েই শুধু হাতের ফোলিও ব্যাগটা মাথায় দিয়ে যে রকম তাড়াতাড়ি সে ওপরের বাঙ্কে উঠে খালি গদির ওপরেই শুয়ে পড়েছিল তাতে সেই অনুমানেরই সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল।

বাথরুমে যাবার জন্যে করিডরে বেরিয়ে চৌধুরি এক সময়ে রিজার্ভেশন স্লিপের নতুন নামটা দেখে আসতে ভুল করেনি।

লোকটার মালপত্র আর চেহারা পোশাকের মতো নামটাও যেন হাঘরে মার্কা। দরজার হাতলে ঝোলানো রিজার্ভেশন কার্ডটায় লেখা মিস্টার এস. পেরিস। পেরিস আবার কী পদবি? খানদানি কোনও ছোঁয়া উচ্চারণে আছে বলে মনে হয় না।

পেরিস যখন এসে কামরায় ঢোকে তখন হাটনরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যে যার বার্থে শুয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। চৌধুরি নিজেও তখন বাঙ্কটা টেনে চওড়া করে তার ওপর হোল্ড-অলটা খুলে বিছানা পেতে কম্বলটা গায়ে টেনে শায়িত অবস্থায় বই পড়ছে। বইটা পড়বার ছলেই সামনে রেখে তার আড়াল দিয়ে পেরিসকে যতটা সম্ভব লক্ষ করবার চেষ্টা করেছিল চৌধুরি।

সময় অবশ্য বেশি পায়নি। পেরিস যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের বাঙ্কে উঠে শোবার জন্য ব্যাকুল। কামরায় আর কে আছে সে যেন লক্ষই করেনি। আর আলাপের চেষ্টা দূরে থাক, একবার কারও দিকে চেয়েও দেখেনি।

উৎসাহভরে আলাপ করেছিল হাটনরা। চৌধুরি কুলির মাথায় সুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে যখন কামরায় ঢুকেছিল তখন তাদের শোবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। দুই বাঙ্কের ওপরই পায়ের দিকে কম্বল পাট করে রেখে পরিপাটি করে বিছানা পাতা। এতক্ষণ কামরা খালি পাওয়া গিয়েছিল বলে দুজনের রাত্রিবাসও বোধহয় এইখানেই পরা হয়ে গেছে। মিস্টার হাটনের গায়ে মিহি পিনস্ট্রাইপ পাজামা স্যুট আর মিসেস হাটনের নাইট গাউন। মিসেস হাটন সুন্দরী শুধু নয়, শৌখিনতায় যে রীতিমতো আধুনিক তা তার রাতের পোশাক থেকেই বোঝা যায়। আর একটু মিহি হলে তা বোধহয় মাকড়শার জালের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত।

চৌধুরি ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার হাটনের সম্ভাষণে চমকে উঠেছিল।

'নমস্তে, মিস্টার চৌধুরী! দশটা এখনও হয়নি। সুতরাং গুড ইভনিংও বোধহয় বলা যায়।'

চৌধুরি একটু থতমত খেয়ে 'গুড ইভনিং' বলেই প্রতিসম্ভাষণ করেছিল।

মিসেস হাটনের এবার জলতরঙ্গ গোছের হাসি শোনা গিয়েছিল। হেসে স্বামীকেই বলেছিল, 'উনি ওঁর নামটা তোমার মুখে শুনে হয়তো একটু ভড়কে গেছেন! রহস্যটা ওঁকে বুঝিয়ে দাও জোসেফ।'

জোসেফ তা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিল—'ট্রেনে যেতে হলে কামরার রিজার্ভেশন স্লিপের নামগুলো আমরা আগেই পড়ে নিই আর চেষ্টা করি সেই নাম থেকে সহযাত্রী বা যাত্রিণীদের চেহারা চরিত্র আন্দাজ করতে। আমরা ছাড়া কামরার আর একজন মাত্র যাচ্ছেন জেনে সত্যিই একটু খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু নামটা আমাদের বেশ একটু অস্বস্তি জাগিয়েছিল স্বীকার করছি—'

চৌধুরি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে জোসেফ হাটন সাহেবের ভাষণ অবশ্য শোনেনি। কুলিকে দিয়ে সুটকেসটা বাঙ্কের নীচে রাখিয়ে হোল্ড-অলটা তার ওপর খোলাবার পর ভাড়া দিয়ে তাকে বিদায় করতে করতেই বেশ একটু প্রচ্ছন্ন কৌতূহলের সঙ্গেই স্বামী স্ত্রীর কথাগুলো শুনেছিল। ট্রেনে এ ধরনের সহযাত্রী পাওয়ার ভাগ্য এর আগে তার সত্যিই হয়নি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তখন উৎসাহভরে চাপানউতোর গাওয়ার ধরনে তাদের কথা বলে যাচ্ছে।

'লরা, মানে আমার স্ত্রীর তো রীতিমতো ভয় হয়েছিল,' জোসেফ হাটন তার ওপরের বাঙ্কে গায়ে দেবার কম্বলটা পাট করে রাখতে রাখতে বলে গিয়েছিল, 'ও একেবারে ধরেই নিয়েছিল চৌধুরি মানেই খিটখিটে বদমেজাজের বুড়ো মিলিটারিম্যান। এক মুখ গোঁফ দাড়ি—'

'না, না আমি দাড়ি বলিনি,' লরা হেসে প্রতিবাদ করেছিল, 'আমি বলেছিলাম একেবারে দু কান পর্যন্ত ছোঁয়া মোটা গোঁফের গোছা—'

'গোঁফ জোড়া হলেও আমার আপত্তি ছিল না,' স্ত্রীকে থামিয়ে বলেছিল জোসেফ, 'আমার ভয় হয়েছিল, চৌধুরি মানেই এমন জাঁদরেল জঙ্গি কেউ হবে যার কাছে আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অকর্মণ্যতার ফিরিস্তি আর নিন্দে শুনতে শুনতে সারা রাত ঘুমোবার অবকাশটুকু পাব না।'

'তা ছাড়া,' লরা নিজের বাঙ্কে উঠে বসার সময়ে সুগঠিত নবনী ধবল পা-দুটির অনেকখানি আচমকা দেখিয়ে ফেলে যেন সে নিরাবরণতা খেয়ালই না করে স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে বলেছিল, 'এসব জঙ্গি বুড়োদের মন বড় গোঁড়া আর সংকীর্ণ হয়। মেয়েদের পোশাক-আশাক সম্বন্ধে এদের মতামত যা সেকেলে, মুখে কিছু না বলুক আমায় কত না ঘেন্নায় ভুরু কোঁচকানো সইতে হবে এই ছিল আমার ভয়।'

'শুধু ভুরু কোঁচকানো বলছ কেন?' জোসেফ হাটন নিজের ওপরের বাঙ্কে উঠে পা ঝুলিয়ে বলেছিল, 'ওই ভুরু কোঁচকানোর পেছনে লোভের চোরা চাউনিও থাকত।'

'আঃ। তুমি বড় অসভ্য, জোসেফ,' চৌধুরির দিকে একটি বেশ লাস্যময় কটাক্ষপাত করে বাঙ্কের বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলেছিল লরা, 'যাক ভাগ্য ভাল। আমাদের গণনা ভুলই

হয়েছে। আমরা এমন চমৎকার সহযাত্রী পেয়েছি। আচ্ছা গুড নাইট, মি. চৌধুরি। আমি আবার বড্ড ঘুম কাতুরে। এখুনি শুয়ে পড়ছি বলে কিছু মনে করবেন না! হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে কামরার আলোটা নিভিয়ে নাইট লাইটটা যদি জ্বালিয়ে দেন। জোসেফের আবার এটা মনে থাকে না।'

চৌধুরি অনুরোধটা রাখতে দেরি করেনি। জোরালো আলোটা নিভিয়ে মৃদু নীল আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে নিজের বাঙ্কে এসে সেটা টানবার ব্যবস্থা করেছে।

ওপর থেকে জোসেফও তখন 'গুড নাইট' জানিয়ে দিল। স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে সেই তার শেষ সম্ভাষণ। দুজনে যেন সুইচ টেপা বাতির মতোই এক মুহূর্তে একেবারে ঘুমের রাজ্যের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে।

তাদের দুজনের এই নিশ্চিন্ত ঘুমই আরও অস্থির করে তুলেছে চৌধুরিকে।

ট্রেনের চাকার কর্কশ ঘর্ঘরের সঙ্গে যখন তার হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা উদ্বেগের পাল্লা চলেছে তখন এদের এই নিশ্চিন্ত ঘুম যেন সহ্য করতে পারছে না চৌধুরি। কিন্তু এদের আর অপরাধ কী। চৌধুরি যার জন্যে সমস্ত শরীর মনে টান হয়ে আছে এরা স্বামী-স্ত্রী তো তার কিছুই জানে না। জানবার তাদের কোনও উপায়ই নেই।

এ কামরায় আর কেউ না উঠলে চৌধুরি খুশি হত, কিন্তু কেমন যেন প্রথম থেকেই সে বুঝতে পেরেছিল এ কামরায় কোনও বার্থ শেষ পর্যন্ত খালি থাকবে না। খালি থাকলে যে ব্যাপারের জন্য এমন ভাবে নিজেকে সে তৈরি করার চেষ্টা করছে তা ঘটাই বুঝি অসম্ভব।

গাড়ির চাকার আওয়াজের একটা দ্রুত পরিবর্তন। বেশ খানিকক্ষণ ধরে শব্দটা ভিন্ন পর্দায় বাঁধা রইল। নিফাদ পার হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। এরপরে আর মিনিট পনেরো বাদেই কাসবে সুকেনে। তারপরই যা ঘটবার ঘটবে।

অন্য তিন বার্থে তিনজনই ঘুমে একেবারে বেহুঁশ। ওপরের বার্থে মি. পেরিস ঘুমোবার বদলে মটকা মেরে পড়ে থাকতেও পারে। চোখে তো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে নড়া-চড়ার শব্দ কিছু পায়নি এই যা।

হোল্ড-অলের ওপরের দিকে ফ্ল্যাপের তলাটা একবার হাতড়ে দেখে নিলে চৌধুরি। হ্যাঁ, জিনিসগুলো ঠিক যথাস্থানেই আছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় একটু ব্যস্ত হয়েই উঠে বসতে হল চৌধুরিকে। হাত ঘড়িটা দেখল পরের স্টেশনটা আসতে আর বড় জোর ন-দশ মিনিট।

এখন, এখন যদি হাটনদের জাগিয়ে দেয়, কী হবে তা হলে?

জাগাতে পারবে না এমন কোনও স্পষ্ট নির্দেশ তো তার ওপর নেই। জাগিয়ে অবশ্য কী বলবে সেটাই হল মস্ত সমস্যা।

হঠাৎ নিশুত রাতে ট্রেনের কামরায় শুধু মাত্র দু-পাঁচ মিনিটের পরিচয় হওয়া অজানা ঘুমন্ত সহযাত্রী দুজনকে কী বলে ডেকে তুলবে?

'উঠুন! শীগগির উঠুন। ভয়ানক বিপদ!' বলে চেঁচাবে কি?

তাদের তো অমন করে ঘুম ভাঙালে খেপে ওঠবার কথা। খেপে যদি বা না যায়, বিপদটা কী তা তো জানতে চাইবে?

কী বলবে তখন?

সত্যি কথাটা বলতে পারবে কি? বললেও তারা কি বিশ্বাস করবে?

অন্তত তার নিজের পরিচয়টা তখন জানতে চাইবে নিশ্চয়। এ রকম একটা আজগুবি ভয় দেখাবার কী অধিকার তার আছে সেটা জানতে চাওয়া তাদের পক্ষে এ অবস্থায় একান্তই স্বাভাবিক।

নিজের সত্যিকার পরিচয় সে তো কোনওমতেই দিতে পারবে না। বিপদটা যথার্থ কী তাও বলা যে তার পক্ষে সম্ভব নয়।

pathagar.net

ভাসাভাসা ভাবে একটু আভাস দিতে গেলেও যে মুশকিলে পড়বে।

মনে মনে বলার কথাগুলো কোনওমতে সাজাবার চেষ্টা সে করেও দেখেছে একবার।

চেঁচিয়ে ডেকে হাটন দম্পতীকে জানাতে গেলে হয়তো ওপরের বাঙ্কের পেরিসও জেগে উঠবে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। সে যে ঘুমিয়েছে তাই তো বিশ্বাস হয় না। মটকা মেরে পড়ে আছে বোধহয়। তার চেঁচামেচিতে জেগে ওঠার ভান করবে।

তা যাই সে করুক, চৌধুরিকে তখন পেরিসকে অগ্রাহ্য করেই যা বলবার বেপরোয়া হয়ে বলতে হবে।

তাড়াতাড়ি এই ক-টা কথাই সে তখন বলতে পারে—'শুনুন রাগ করবেন না। আপনাদের না জাগিয়ে উপায় ছিল না। আর কয়েক মুহূর্তেই মধ্যেই এক ভয়ংকর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। অন্তত ঘটার পুরো সম্ভাবনা আছে বলে ভয়। আর দু-চার মিনিটের মধ্যেই একটা স্টেশন আমরা পার হয়ে যাব। তারপরেই আসবে একটা টানেল। খুব লম্বা দীর্ঘ টানেল!'

না, তার বলাটাও অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কাউকে আচমকা ধড়মড় করে জাগিয়ে এমন গদাই লশকরি কৈফিয়ত দেওয়া যায় না।

আরও সংক্ষেপে বলতে হবে—'শুনুন, এখুনি একটা টানেল আসছে। সে টানেলে গাড়ি ঢোকার পর ভয়ংকর একটা ব্যাপার হতে পারে। এর আগে ক-বার হয়েছে। আপনারা জেগে তৈরি থাকুন। আমিও তৈরি আছি।'

না, এ কৈফিয়তও ঠিক হবে না। ভয়ংকর বিপদটা কী ধরনের, টানেলে গাড়ি ঢোকবার পর কী বিভীষিকা সেখানে অপেক্ষা করে থাকতে পারে তা একটুখানি বুঝতে না দিলে নয়।

কিন্তু বোঝাবে কী, সে নিজেই ঠিক মতো এখনও বুঝেছে কি?

সে যা বুঝেছে তা তো প্রায় অলৌকিক-ভৌতিক আজগুবি ব্যাপার। তার প্রতিকারের জন্যে তৈরি থাকা যায়, তা কাউকে বলা যায় না।

এই টানেল সম্বন্ধে একটা জরুরি গুপ্ত রিপোর্ট তাদের দপ্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

রিপোর্টের মতে ব্যাপারটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ও অত্যন্ত জরুরি। অবিলম্বে কোনও যোগ্য লোককে তদন্তে যেন পাঠানো হয়।

তদন্তটা যা নিয়ে হবে তা একদম ধোঁয়াটে ব্যাপার। তার সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই বললেই হয়, যা আছে তাও নির্ভরযোগ্য নয়।

এ-বছর শীতকাল শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনবার এই লাইনে এই টানেলের মধ্যে অদ্ভুত ক-টা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটে গেছে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যেই।

টানেলটা বেশ লম্বা। প্রায় মিনিট পনেরো লাগে সেটা পার হতে।

এই টানেল পার হবার সময় গত নভেম্বর থেকে বর্তমান জানুয়ারির মধ্যে তিন-তিনবার তিনটি মৃতদেহ টানেলের মধ্যে রেল লাইনের ধারে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

মৃতদেহ তিনটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে দেহটাকে কেউ ট্রেনের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে। টানেলের দেয়ালে লেগে সেটা লাইনের ধারেই কোথাও পড়েছে তার পর।

এই ভয়ংকর হত্যার ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হল এই যে খুন যারা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিনজনই মহিলা এবং তিনজনই প্রথম শ্রেণীর যাত্রিণী।

খবরের কাগজের শ্যেন দৃষ্টি থেকে কোনও মতে ব্যাপারটা এখনও আড়াল করে রাখা হয়েছে। কিন্তু আর তা পারা যাবে কি না সন্দেহ। সেই বিশ্রী হইচই শুরু হওয়ার আগে রেল থেকে আরম্ভ করে পুলিশের সমস্ত বিভাগ কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছে এ খুনের রহস্যের সমাধান করতে। ঘটনা দুটো যাদের অজানা নয় তাদের কারও কারও মধ্যেও ব্যাপারটা ভৌতিক বলে কেমন একটা সন্দেহ যেন দেখা দিয়েছে।

রেল ও গোয়েন্দা পুলিশ চেষ্টার কিছু ত্রুটি রাখছে না। প্রতিদিন ওই লাইনের সব ক-টি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সাদা পোশাকের পাহারা তো যাচ্ছেই, সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টগুলির যাত্রীর তালিকাও সযত্নে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

এসব সাবধানতা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের যোগ্য একজনকে প্রত্যেকটি রাত্রির ট্রেনে পাঠাবার ব্যবস্থাও সম্প্রতি হয়েছে।

চৌধুরির আগে আর একজন তার সহকর্মী এই গোপন পাহারাদারি করে গেছে। সেদিন অবশ্য কিছু ঘটেনি।

চৌধুরির বেলাও কিছু যে ঘটবেই এমন জোর করে বলা যায় না। তবু কিছু ঘটুক-না-ঘটুক তটস্থ থাকতে হবে সমানেই।

আর যাদের জন্যে এই উৎকণ্ঠিত অস্থিরতা তাদের আগে থাকতে কিছু জানানোও যাবে না।

তার বদলে চৌধুরিকে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সজাগ হয়ে থাকতে হবে। কিছু ঘটলে বিদ্যুতের বেগে যেন সাড়া দিতে পারে।

ও কী! ও তো চাকার শব্দ বদলে গেল। তার মানে কাসবে সুকেনেও পার হয়ে যাচ্ছে। আর ক-টা সেকেন্ড মাত্র।

আওয়াজ আবার বদলাল। তার মানে টানেলে ঢুকছে ট্রেন।

কিছু হবার হলে এইবার, হ্যাঁ, এইবারই!

বুকটা কেঁপে ওঠে চৌধুরির। নীল আলোটাও নিভে গেল। একেবারে কালি মাড়া অন্ধকার।

তা হোক অন্ধকার। ওপরের বাঙ্কটার দিকে কানটা খাড়া রাখার সঙ্গে সমস্ত মনটা নিবিষ্ট করে রেখে সে হোল্ড-অলের মাথার দিকের ফ্ল্যাপের ভেতর থেকে টর্চটা বার করবার জন্য হাত বাড়ায়।

মনটার সঙ্গে সমস্ত শরীরটা সে স্প্রিংয়ের মতো যেন গুটিয়ে টেনে রেখেছে। ওপর থেকে এতটুকু বেয়াড়া নড়াচড়া টের পেলেই লাফ দিয়ে উঠবে।

টর্চটা সে হাতড়ে পায়, কিন্তু তা জ্বালা আর তার হয় না। হঠাৎ অত্যন্ত কোমল, সুঠাম একটা দেহভার তার সমস্ত শরীরের ওপর প্রসারিত হচ্ছে সে টের পায়, সেই সঙ্গে একটা তীব্র অসহ্য মধুর গন্ধ যা ধীরে ধীরে তার চেতনাই যেন মুছে দেয়।

জ্ঞান যখন ফেরে তখন টানেল পার হয়ে ট্রেনটা ছোট একটা স্টেশনে থেমেছে। ছোট স্টেশন, কিন্তু দারুণ হইচই।

হইচই তাদের কামরার মধ্যেও।

তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কে একজন কী লক্ষ করছিল।

দৃষ্টিটা ভাল করে ফিরে পাবার পর লোকটা যে পেরিস তা বুঝতে পারে চৌধুরি।

'না, না—উনি ঠিক আছেন। ওঁর আর কিছু করতে হবে না,' বলছে পেরিস।

কিন্তু ওই হাঘরে চেহারার লোকটার এত খাতির কীসের। রেল পুলিশের একজন অফিসারও কামরায় আছেন।

তিনি বেশ সসম্ভ্রমে বলেন, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মি. বর্মা।'

বর্মা! পেরিসকে আবার বর্মা বলা কেন? তা হলে পেরিসটা ছদ্মনাম নাকি? আসলে এই ছদ্মবেশে আর ছদ্মনামে উনিই কি স্বনামধন্য পরাশর বর্মা?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। খানিক বাদেই সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারে।

মি. আর মিসেস হাটনকে এখন পুলিশ হেফাজতে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দু জনের শয়তানি খেল আজ থেকে খতম।

দু জনেই আন্তর্জাতিক দাগি আসামি। ওদের অনেক খেলের মধ্যে এই ভুতুড়ে হত্যা-বিভীষিকা একটা।

স্বামী-স্ত্রী সেজে নানা নামে তারা প্রায়ই বিশেষ বিশেষ লাইনে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হয়। তার পর সুযোগ সুবিধা হলে আর ধনী কোনও মহিলা যাত্রী পেলে ওই ভাবে হত্যা করে যথাসর্বস্ব নিয়ে ব্যাপারটাকে একটা ভৌতিক চেহারা দেয়।

এই ভৌতিক চেহারার দরুনই রহস্যটার মীমাংসা এতদিন একটু গুলিয়ে যাচ্ছিল। পরাশর বর্মার চেষ্টাতেই আজ হাতেনাতে খুনিরা ধরা পড়ল।

লরা মানে মিসেস হাটন যখন চৌধুরির বুকের ওপর উঠে তার নাকে ক্লোরোফর্মের রুমাল চেপে ধরেছিল তখন জোসেফও তাই করতে গিয়েছিল পেরিসরূপী পরাশর বর্মাকে। কিন্তু প্রস্তুত ছিল বলে পরাশর হঠাৎ উঠে বসে জোসেফের নাকেই অজ্ঞান করবার ওষুধ মাখানো রুমাল চেপে ধরে। জোসেফ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়বার পর লরাকে কায়দা করতে খুব দেরি হয় না।

ট্রেন তখন টানেল পেরিয়ে পরের স্টেশনের কাছে পৌঁছে গেছে। পরাশর বর্মা অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেন সেখানে থামায়।

এতদিন যারা মহিলাদেরই শিকার করছিল তাদের হঠাৎ নিয়ম বদলে চৌধুরিকে আক্রমণ করতে যাওয়া অদ্ভুত।

তবে রিজার্ভেশন স্লিপে চৌধুরির নামটা ভুল লেখার মধ্যেই বোধহয় কারণটা ছিল। সেখানে চৌধুরির নামটা লেখা ছিল মিসেস এস চৌধুরি বলে। চৌধুরি মিস্টারের এম আর-এর পরে ফালতু এস্‌টাতে তখন একটু কৌতুকই বোধ করেছিল।

ওই এস্‌টা যে পরাশর বর্মার পরামর্শেই লাগানো তা জানলে খুব খুশি বোধহয় হত না।

হাটনেরা আগে থাকতে কামরার সহযাত্রীদের নাম যেমন করে হোক সংগ্রহ করত। ভুসওয়াল থেকেই জলগাঁওয়ে কোনও মিসেস চৌধুরির একা কামরায় ওঠার খবর নিশ্চয় তারা পেয়েছিল। মিসেস এস চৌধুরি মিস্টার হয়ে যাবার পর একটু হতাশ হলেও আগে থাকতে আয়োজন করা খুনের ব্যাপারটা বাতিল করতে পারেনি।

পরিশিষ্ট

pathagar.net

সুন্দ-উপসুন্দের আধুনিক উপাখ্যান

('প্রেমের ত্রিকোণে পরাশর' গল্পটির ভিন্ন পাঠ)

নামটা ধরা যাক শোভনা দেবী। যৌবনের প্রায় সীমান্তে এসে পৌঁছলেও পোশাকে প্রসাধনে শোভনা দেবী আসল বয়সটাকে বেশ ভাল রকমই চাপা দিয়ে রেখেছেন। একেবারে আঠারো-উনিশ না মনে হোক, পঁচিশ থেকে তিরিশের কোঠায় তাঁকে অনায়াসে ফেলা যায়।

শোভনা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আমি তাঁকে চিনি। আমার কাগজে বার কয়েক তাঁর ছবিও ছেপেছি সাগ্রহে। সে অবশ্য প্রায় বছর সাতেক আগেকার কথা। শৌখিন রঙ্গমঞ্চে প্রথম সগৌরবে দেখা দিয়ে শোভনা দেবী তখন ছায়াছবির জগৎও জয় করবার উপক্রম করছেন। তাঁর সম্বন্ধে ছবির জগতে তখন বেশ সাগ্রহ আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলা ছবিতে নায়িকার দুর্ভিক্ষ। শোভনা দেবী সেদিক দিয়ে একটা বড় অভাব পূর্ণ করবেন, সকলে মনে করেছে।

সে প্রত্যাশা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। হঠাৎ শোভনা দেবী শুধু চিত্রশিল্প থেকেই নয়, রঙ্গমঞ্চ থেকেও সরে দাঁড়িয়েছিলেন। চিত্র ও নাট্য জগৎ বিস্ময় বিমূঢ় হয়েছিল সত্যই। সাংবাদিকেরা এ রহস্যের মূল খোঁজবার চেষ্টা করেনি এমন নয়। তবে বিশেষ কিছু তারা সন্ধান করে পায়নি। শুধু একটা গুজবগোছের শোনা গিয়েছিল যে শাঁসালো কোনও মক্কেলকে পাকড়াও করেই নাকি শোভনা দেবী পরদা ও মঞ্চ ছেড়ে সংসারী হতে চলেছেন।

সে গুজবও কিন্তু সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। হলে আর যার কাছেই হোক, শ্যেনদৃষ্টি সাংবাদিকদের কাছে এ রকম একটা রসালো খবর গোপন থাকত না। তবে শোভনা দেবীর হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের ওপর একটু আলোকপাত তখন হয়েছিল। তাঁর পাণিপ্রার্থী যে একজন নয়, দু-জন—এই খবরটি জানা গিয়েছিল তখন। দু-জনেই যাকে বলে ঐশ্বর্যের চূড়ায় আসীন। শুধু একজনের সম্পদ শিল্প-ব্যবসায়ে স্বোপার্জিত, আর অন্যজনের পৈতৃক উত্তরাধিকারে পাওয়া।

শোভনা দেবী সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল যথারীতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। চিত্রাকাশে নতুন তারকার উদয় হয়েছে। শোভনাদেবী তাতে ম্লান হয়ে একদিন পুরনো কাগজের ফাইলের মধ্যেই অস্তমিত হয়েছেন।

সেই শোভনা দেবীকে এতদিন বাদে হঠাৎ সকালে পরাশরের ঘরে দেখে অবাক হওয়া নিশ্চয়ই স্বাভাবিক।

মহিলা বলে দরজা থেকে ফিরিয়ে না দিলেও পরাশর তার অপ্রসন্নতাটা গোপন করলে না।

শোভনা দেবীকে ঘরে এনে বসাবার পর আমি উঠে দাঁড়ালাম। শোভনা দেবী নিশ্চয় কোনও গুরুতর বিষয়ে পরাশরের পরামর্শ নিতে এসেছেন। আমার এখানে থাকাটা তিনি পছন্দ না-ও করতে পারেন।

আমায় উঠতে দেখে পরাশর কিন্তু একটু রুক্ষ স্বরেই বললে, 'তুমি উঠছ কেন? বোসো।'

'কিন্তু আমার কথাটা একটু গোপনীয়।' শোভনা দেবী আমার দিকে একবার ভ্রুকুটিভরে চেয়ে বললেন।

'প্রকাশ্য বা গোপনীয় যা-ই হোক, আজ তো আপনার কথা শুনতে পারব না।' পরাশর শক্ত কথাগুলো এবার শুধু গলাটা একটু মোলায়েম করে বিনীত ভঙ্গিতে বললে, 'আপনি না জেনে একেবারে বাড়ির দরজায় এসেছেন, তাই ঘরে এনে বসিয়েই কথাটা জানাচ্ছি। আগে থাকতে ঠিক করা না থাকলে, আমি বাড়িতে কারও সঙ্গে দেখা করি না।'

'দেখা করেন না! তার মানে আপনার সাহায্য বা পরামর্শ চাইতে আসতে হলে আগে থাকতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে!'

শোভনা দেবীর মুখে কেমন একটু তিক্ত দুর্বোধ্য হাসি।

পরাশর সেটা লক্ষ নিশ্চয় করলেও অগ্রাহ্য করে বললে, 'হ্যাঁ, আপনি বরং কাল এই সময়ে আসবেন। আপনার যা বলবার আছে, আমি শুনব।'

'তখন আর আপনাকে শোনাবার কিছু থাকবে না। যা শোনাবার পুলিশকেই শোনাতে হবে।'

শোভনা দেবীর মধ্যে চিত্রতারকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখে কেন যে অনেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, এই কথাগুলি বলার ভঙ্গি আর গলার স্বরেই তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে সে স্বরে ও ভঙ্গিতে এমন একটু বেদনা মেশানো, যা অভিনয়ে ফোটাতে পারলে অনেক নাম করা অভিনেত্রীও ধন্য হয়ে যেতেন বোধহয়।

ব্যাপারটা এখন কিন্তু অভিনয় নয় বলেই মনে হল আমার। পরাশরেরও ধারণা সেই রকম হয়ে থাকবে নিশ্চয়, কারণ একটু চুপ করে থেকে এই প্রথম যেন শোভনা দেবীকে ভাল করে একটু লক্ষ করে সে আগেকার রুক্ষ স্বর পালটে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি যা আশঙ্কা করছেন, তা আজকের মধ্যেই ঘটবে বলে আপনার বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা-ই।' শোভনা দেবী গাঢ় গভীর স্বরে বললেন, 'আপনার কাছে সেই জন্যেই ছুটে এসেছি।'

'আপনার তা হলে ধারণা যে আদিত্যপ্রতাপ আর মহীধরের মধ্যে আজই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে?'

চমকে উঠে শোভনা দেবীর মতো আমিও হতভম্ব হয়ে পরাশরের দিকে তাকালাম।

শোভনা দেবীই প্রথম কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বিমূঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এ কথা জানলেন কী করে?'

'সে ব্যাখ্যা পরে হবে।' পরাশরের গলায় একটু অধৈর্য প্রকাশ পেল, 'এখন আসল বিষয়টারই আলোচনা হোক। আদিত্যপ্রতাপ আজই ভয়ানক কিছু করবে আপনি ভাবছেন? ভয়ানক কিছু মানে তো মহীধর চৌধুরীকে খুন করবার চেষ্টা?'

শোভনা দেবী হতভম্বের মতো একটু ঘাড় নাড়লেন।

পরাশর আবার বললে, 'কিন্তু ছোরাছুরি নিয়ে খুন করবার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন না। মহীধরকে মারবার চেষ্টা করলে পিস্তল দিয়েই করবে। আদিত্যপ্রতাপের পিস্তল আজ সাত দিন হল চুরি গেছে তা নিশ্চয় জানেন?'

'জানি! জানি!' শোভনা দেবী এবার একটু উত্তেজিত, 'কিন্তু সে চুরির খবর সত্য নয়।'

'সত্য নয় আপনি ঠিক জানেন?' পরাশর তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

'একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলেও তা-ই আমার অনুমান। আর এ অনুমান কেন ভুল নয় তা বলছি—'

শোভনা দেবীকে থামিয়ে দিয়ে কথার মাঝখানেই পরাশর বললে, 'তা বলবার আগে আর একটা কথা জানান দেখি। আদিত্য ও মহীধরের তো গলায় গলায় ভাব। তাদের মধ্যে সম্প্রতি কোনও ঝগড়া হয়েছে?'

'না।' যেন অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করলেন শোভনা দেবী, 'কিন্তু বাইরের ঝগড়াই তো আসল নয়।'

'ঠিকই বলেছেন।' পরাশর এবার বিদ্রুপ-তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, 'ভেতরে ভেতরে ওরা পরস্পরের পরম শত্রু। আর তার কারণ আপনি।'

শোভনা দেবী মাথাটা নিচু করলেন।

পরাশর আবার বলে গেল, 'আজ পাঁচ বছর ধরে আপনাকে নিয়ে দুই বন্ধুর গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আপনি তাতে ইন্ধন জুগিয়ে আসছেন, হয়তো উপভোগও করছেন আপনার জন্যে দু-জনের এই সুন্দ-উপসুন্দর গোপন লড়াই।'

'না, না, না!' শোভনা দেবী তীব্র যন্ত্রণার স্বরে প্রতিবাদ করলেন, 'আমি প্রাণপণে ওদের মধ্যে বোঝাপড়া করাবার চেষ্টা চেয়েছি। ওদের মধ্যে এ গোপন শত্রুতার বিষ যাতে ভয়ংকর কিছুতে না পৌঁছয় তার জন্যে নিজেকেই শাস্তি দিয়ে এই সাত বছর আমার সত্যিকার মনের কথা লুকিয়ে রেখেছি দু-জনের কাছ থেকেই। দু-জনের কাউকেই বিয়ে করতে রাজি হইনি। কিন্তু তাতেও সর্বনাশ ঠেকাতে পারলাম না। মহীধর আদিত্যকে কম হিংসে করে না, তবু আদিত্যের মতো উন্মাদ সে নয়। আদিত্য কিছুদিন আগে আমার কাছে বিয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চায়। সে বলে যে ধৈর্যের সীমা সে পার হয়ে গেছে। তাকে বিয়ে করতে রাজি না হলে সে এবার সাংঘাতিক কিছু না করে ছাড়বে না। আদিত্যকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করে বিফল হয়ে শেষে আমি বলতে বাধ্য হই যে তারা দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে সত্যিকার মিটমাট না করে নিলে কাউকেই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত নই। এ কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আদিত্য বলে যে, দু-জনের একজন না থাকলেই তো সমস্যা মিটে যাবে। মহীধর গোপনে সেই চেষ্টাই যে করছে তা সে জানে। কিন্তু মহীধরের ওপর টেক্কা দেবার ব্যবস্থা আদিত্য করেছে। মহীধরকে সে আগেই শেষ করে দেবে।'

'উত্তেজনা ও রাগের মাথায় মানুষ কত কিছু অমন বলে!' পরাশর মন্তব্য করলে তাচ্ছিল্যের সুরে।

'না, না, রাগের মাথার আস্ফালন এ নয়।' শোভনা দেবী ব্যাকুল হয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'ওই কথার দু-দিন বাদে আমরা তিনজন রাত্রে একটি হোটেলে ডিনার খেতে গেছলাম।'

আমার মুখের বিস্ময়টুকু চোখে না পড়লেও কথার মাঝেই পরাশরের মুখের ব্যঙ্গের হাসিটা লক্ষ করে শোভনা দেবী একটু থেমে বললেন, 'অমন বাঁকা হাসি হাসছেন কেন? দুই বন্ধুর শত্রুতা যে বাইরের নয়, ভেতরের, সে তো আগেই বলেছি। এখনও তিনজনেই আমরা বেশির ভাগ একসঙ্গে থাকি। ভেতরের হিংসার টানেই ওরা দুজনে যেন পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে না।'

শোভনা দেবী একটু থামতেই পরাশর বললে, 'বাঁকা হাসি যদি আমার মুখে দেখে থাকেন সেটা আপনারা তিনজনে একসঙ্গে ডিনারে গেছলেন শুনে নয়, আপনি আমার কাছে সত্য গোপন করেছেন বলে।'

'সত্য গোপন করেছি!' শোভনা দেবীর গলা একটু ঝাঁঝালো হয়ে উঠল ক্ষোভে, 'আমার কথা সব না শুনে সত্য গোপন করেছি কি না বুঝলেন কী করে? সত্যটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম।'

'কী বলতে যাচ্ছিলেন?' পরাশর যেন খোঁচা দিয়ে বললে, 'আদিত্যপ্রতাপ সেই রাত্রেই তার রিভলভার চুরি যাবার কথা প্রকাশ করে, এই তো?'

'হ্যাঁ,' বিমূঢ়ভাবে পরাশরের দিকে তাকিয়ে শোভনা দেবী বললেন, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু বলার আছে।'

'যেমন?'

'যেমন, চুরির কথাটা যে তার বানানো, তা সেই রাত্রেই বুঝতে পারি। ডিনার থেকে ফেরবার

সময় মহীধর প্রথম তার বাড়িতে নেমে যায়। তারপর মহীধরেরই গাড়ি নিয়ে আদিত্য আমায় বাসায় পৌঁছে দেবার সময়—'

নীরব শ্রোতা হয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। শোভনা দেবীকে বাধা দিয়ে বললাম, 'মাফ করবেন, আমার এখানে থাকাটাই অন্যায়, তার ওপর একটু অনধিকার চর্চা করছি। গাড়িটা বললেন মহীধর প্রধানের, তা হলে আদিত্যপ্রতাপ সেটা চালিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিতে গেলেন কেন? এটা কি বাইরের বন্ধুত্বের একটা নিদর্শন?'

'কিছুটা তাই!' শোভনা দেবী আমাকে উপেক্ষা করে যেন পরাশরকেই শোনালেন, 'আদিত্যর পেয়ারের গাড়িটা মহীধরের কারখানাতেই তখন ওভার হলিং-এর জন্যে ছিল। মহীধরের গাড়ি বলেই সে শেষ পর্যন্ত আমায় পৌঁছে দেবার সুযোগ পাবে, এ ব্যবস্থায় ঠাট্টা করে প্রতিবাদ করেছিল আদিত্য। মহীধর তখনই উদারভাবে গাড়িটা সে রাত্রের মতো আদিত্যকেই দিয়েছিল চালাতে।'

'আদিত্যর প্রতিবাদটা কিন্তু শুধু নির্দোষ ঠাট্টা নয়,' পরাশর মন্তব্য করলে, 'মহীধরের উদারতাটাও নয় খাঁটি বন্ধুপ্রীতি।'

'মহীধরের মনের কথা বলতে পারব না,' শোভনা দেবী একটু যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু আদিত্যর প্রতিবাদটা যে নিছক হালকা ঠাট্টা নয়, সে আমি তখনই বুঝেছিলাম। মহীধরকে নামিয়ে দেবার পরই তার আক্রোশ ফেটে বেরোয়। দাঁতে দাঁত চেপে সে আমায় বলে, "মহীধর গাড়িটা আমায় আজ ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে উদার সেজেছে। কিন্তু ওর শয়তানি তুমি না বুঝতে চাও, আমার বুঝতে বাকি নেই। আমার পিস্তল ও-ই চুরি করিয়েছে, তা কি আমি জানি না?"

আমি তাতে বাধা দিয়ে বলেছিলাম, "তোমার পিস্তল যে চুরি গেছে তারই বা ঠিক কী? ভুলে কোথাও রেখেছ, এখন খুঁজে পাচ্ছ না, এমনও হতে পারে তো?"

আদিত্য হঠাৎ গাড়িটা রাস্তার ধারে থামিয়ে আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে চেয়ে হেসে উঠে বলেছিল, "তাই যদি হয়, তা হলে তোমার সব সমস্যা মিটে গেছে জেনো।"

তার গলার স্বরে ও বলার ধরনে ভয় পেয়ে আমি বলেছিলাম, "তার মানে?"

"তার মানে, মহীধর আর তিনদিন তোমার কাছে উদার মহৎ সেজে থাকবার সুযোগ পাবে। তিনদিন বাদেই ওর গ্যারেজ থেকে আমার গাড়ি মেরামত হয়ে বেরোবে। সেই গাড়ি নিয়েই আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব, গাড়ি মেরামতের খুঁত ধরে ঝগড়া করতে। দুই বন্ধুর ঝগড়া হঠাৎ তুমুল হয়ে উঠে, কী থেকে কী হয় কেউ বলতে পারে না!"

আদিত্য প্রায় স্বাভাবিক গলাতেই কথাগুলো বলেছিল, কিন্তু ভয়ে বুকের ভেতরটা তখন আমার হিম হয়ে গেছে। আমি তার হাত ধরে মিনতি করে বলেছিলাম, "এরকম সাংঘাতিক কথা মুখে উচ্চারণ দূরে থাক, সে যেন মনেও না ভাবে।"

"কাজে না করে, মজা হিসেবে মনে মনে ভাবতে দোষ কী!" বলে সে যে ভাবে হেসে উঠেছিল তাতে আমি শিউরে উঠেছিলাম ভেতরে ভেতরে। মহীধরকে শেষ পর্যন্ত একথা আমি না জানিয়ে পারিনি, মহীধর কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। বলেছে, "আদিত্য তোমায় ঠাট্টা করে বোকা বানিয়েছে, তা-ও বুঝতে পারোনি।"

আমি কিন্তু সত্যি তা বুঝিনি। আমার পেড়াপিড়িতে মহীধর আদিত্যকে মেরামত করা গাড়ি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে একটা কৌশল করতে রাজি হয়েছে। গাড়িটা আদিত্যর বাড়ির বদলে গ্যারেজের ড্রাইভার যেন ভুল করে মহীধরের বাড়ির সামনেই রেখে যাবে। আমিই মহীধরের বাড়িতে ওই সময়ে উপস্থিত থেকে আদিত্যকে ফোন করে সে কথা জানাব আর মহীধরের গাড়িটা পাঠিয়ে দেব তাকে আনতে। গাড়ি কীরকম চালু হল দেখবার জন্যে আমাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসবার অনুরোধও জানাব সেই সঙ্গে। সত্যিই যদি তার মনের

ভেতরে কোনও ভয়ংকর মতলব তখনও থাকে, তা হলে এই ব্যবস্থায় হয়তো তা কেটে যেতে পারে মনে করেছি। মনে করলেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ সত্য বা মিথ্যা দুই-ই হতে পারে। সুতরাং পুলিশকে একথা জানানো যে যায় না, তা বুঝতেই পারছেন। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আজ সেই গাড়ি ফেরত দেবার দিন। সকালেই গাড়ি দেবার কথা ছিল। আদিত্য কারখানায় কয়েকবার এর মধ্যে ফোন করেছে। দেরি হবার নানা মিথ্যে কৈফিয়ত তাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর তা চলবে না। আমি এখান থেকে মহীধরের বাড়িতেই যাচ্ছি। এখন বিপদ যদি সত্যি কিছু থাকে আপনি তা ঠেকাবার ব্যবস্থা করতে পারেন কি না?'

শোভনা দেবী ক্লান্ত ভাবে থামলেন পরাশরের মুখের দিকে উৎসুক-কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে।

পরাশরের ব্যবহার তখন সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছে। শোভনা দেবীর শেষ কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি, এমন অন্যমনস্ক ভাবে সে তখন ঘরের কোণে জড়ো-করা পুরনো খবরের কাগজের তাড়াই ঘাঁটছে।

শোভনা দেবী আবার প্রায় হতাশ ভাবে বললেন, 'আপনার কোনও সাহায্য কি তা হলে পাব না?'

কাগজ ঘাঁটা থামিয়ে পরাশর বেশ একটু তাচ্ছিল্যভাবেই বললে, 'সাহায্য করবার কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া সম্পূর্ণ সত্য না জানলে বাইরের কারও পক্ষে সাহায্য করা কি সম্ভব?'

'সম্পূর্ণ সত্য কি আপনাকে জানাইনি!' শোভনা দেবীর গলার স্বর এবার ব্যথিত হলেও অন্যায় অভিযোগের প্রতিবাদে একটু তীক্ষ্ণ, 'সমস্তকথাই তো আপনাকে বললাম।'

'বলেছেন কি না ভাল করে মনে করে দেখুন।' পরাশরের মুখে আবার একটু বাঁকা হাসি।

'মনে করবার কিছু নেই। আপনাকে অকপটে সব কথাই—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে শোভনা দেবী কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'একটা সামান্য কথা অবশ্য আপনাকে বলা হয়নি। কিন্তু সেটা যে বলবার মতো কথা, তা আমার মাথাতেই আসেনি।'

'কথাটা কী?' পরাশর গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলে।

'সেদিন ডিনারের আগে আমরা একটা ইংরেজি ছবি দেখতে গেছলাম,' বললেন শোভনা দেবী, 'ছবিটা ঐতিহাসিক। তাতে এক জায়গায় একই নায়িকার দুই প্রণয়ীর একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্য আছে তলোয়ার নিয়ে। ডুয়েল শুরু হতেই আদিত্য হেসে উঠে বলেছিল, "এ যুদ্ধ মানে তো খানিকটা তলোয়ারের খেলা দেখানো। নইলে কে জিতবে তা তো ঠিকই হয়ে আছে।"

"কে জিতবে, তোমার মনে হয়?" জিজ্ঞেস করেছিল মহীধর।

"তোমার কী মনে হয়, তাই আগে বলো না?" আদিত্যর গলাটা একটু রূঢ় লাগায় আমি সত্যি অবাক হয়েছিলাম। ভেতরে যা-ই থাক, বাইরে তো দু-জনে তা এতটুকু প্রকাশ হতে দেয় না।

আমি তাই আলোচনাটা চাপা দেবার জন্যে ঠাট্টার সুরে বলেছিলাম, "এটা সিনেমা হল। কথা বললে অন্য লোকের অসুবিধে হতে পারে।"

"না, এখন হবে না," আদিত্য তবু জেদ ধরে বলেছিল, "তলোয়ারের খেলা শুধু চোখে দেখবার, শোনবার তো নয়। কই মহী, কে জিতবে তোমার মনে হয়, তা তো বললে না?"

"বলতেই হবে আমাকে!" হেসে বলেছিল মহীধর।

"হ্যাঁ, বলো শিগগির! খেলা প্রায় শেষ হতে চলল।" আদিত্য কড়া গলায় বলেছিল।

"মেয়েটির ভালবাসায় যে অযোগ্য জিতবে সে-ই। কিন্তু তবু মেয়েটিকে সে পাবে না।" শান্ত স্বরে বলেছিল মহীধর, "তলোয়ারের কেরামতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকই ভেদ করা যায়, প্রেমিকার হৃদয়ের নাগাল পাওয়া যায় না।"

"বেশ মনোমতো ধারণা গড়ে তুলেছ তো!" হেসে উঠে বলেছিল আদিত্য।

ছবিতে তলোয়ারের খেলা শেষ হয়েছিল সেই মুহূর্তেই। মহীধরের অনুমান অবশ্য ঠিক হয়নি। প্রেমের যে অযোগ্য সেই হেরেছে, তবে হঠাৎ সিনেমাসুলভ মহৎ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বেচ্ছায় খেলায় ভুল করে।

এরপর আর কোনও কথা এ-বিষয়ে হয়নি। সিনেমা থেকে আমরা হোটেলে গেছি ডিনার খেতে।'

শোভনা দেবীর কথা শেষ হবার পর পরাশর একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা, এখন আপনি যেতে পারেন।'

'যাচ্ছি। কিন্তু আপনার সাহায্য পাব কি না তা তো জানলাম না।' শোভনা দেবী পরাশরের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকালেন।

'হ্যাঁ, সাহায্য যা আমার সাধ্য তা করব।' পরাশর ধীরে ধীরে যেন ভেবে ভেবে বললে, 'তবে সে সাহায্য পেয়ে আপনি খুশি হবেন কি না জানি না।'

'মানেটা বুঝতে পারলাম না।' শোভনা দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তবে তা বোঝবার জন্যে অপেক্ষা করার আর সময় নেই। আপনি যেটুকু আশ্বাস দিলেন, তার জন্যেই ধন্যবাদ দিয়ে আমি মহীধরের কাছে এখুনি যাচ্ছি।'

শোভনা দেবী দরজার দিকে পা বাড়াতেই পরাশর তাঁকে থামিয়ে বললে, 'দাঁড়ান! যাবার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। স্টেজ ও সিনেমা থেকে বিদায় নেবার সময় কার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা ঠিক ছিল? মহীধরের?'

'হ্যাঁ,' প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন শোভনা দেবী, 'তখনও আদিত্যর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। মহীধরের বন্ধু হিসেবেই আদিত্যর সঙ্গে আমার আলাপ হয়—'

শোভনা দেবী আরও কিছু হয়তো বলতেন। কিন্তু, 'আচ্ছা, নমস্কার' বলে পরাশর তাঁকে যেন একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বিদায় দিলে।

পরাশর দরজা পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার পর আমি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, 'এ যে রীতিমতো নাটকীয় ব্যাপার! শোভনা দেবী মঞ্চে কি পরদাতেও এরকম নাটকে নেমেছেন কিনা সন্দেহ।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' পরাশর যেন এড়িয়ে যেতে চাইল প্রসঙ্গটা।

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললাম, 'ব্যাপারটা একটু খুলে আমায় বলবে?'

'বলবার কী আছে?' পরাশর এখনও যেন পাশ কাটাতে চায়, 'যা শোনবার সব তো শুনলে। তা ছাড়া শোভনা দেবীর অনেক ইতিহাস কাগজওয়ালা হিসেবে তোমার তো আমার চেয়ে বেশি জানবার কথা।'

'জানবার কথা, কিন্তু কিছুই জানতাম না দেখছি। কোনও ধনকুবেরকে বিয়ে করে সংসারী হবেন বলে শোভনা দেবী স্টেজ বা সিনেমা ছেড়ে দিচ্ছেন, এইটুকুই জেনেছিলাম। তুমি তো দেখলাম তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি টাটকা খবর রাখো। কেমন করে জানলে?'

'না শুনে যখন ছাড়বে না,' পরাশর হেসে বললে, 'একটু অপেক্ষা করো। আমি কাগজগুলো একটু দেখে নিই। সময় সত্যিই বড় কম।'

পরাশর আবার সেই পুরনো কাগজের তাড়া ঘাঁটতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে আর না বলে পারলাম না, 'সময় কম বলছ, তা হলে এখন পুরনো কাগজ ঘাঁটার কী দরকার!'

'দুনিয়ায় পুরনো বলে কিছু নেই হে?' পরাশর যা খুঁজছিল তা-ই পেয়েই বোধহয় কাগজটা নিয়ে টেলিফোনের দিকে যেতে যেতে দার্শনিক মন্তব্য করলে, 'যা পুরনো, তা-ই আবার নতুন হয়ে দেখা দিচ্ছে।'

ফোনটা তুলে ডায়াল করে পরাশর কাকে ডাকল বুঝতে পারলাম না। ওদিক থেকে সাড়া আসতেই, নাম ধরে কাউকে সম্বোধন না করে সে যা বললে, তা একটু অদ্ভুত। বললে, 'হ্যাঁ, আমি পরাশর বর্মা বলছি, শুনুন, বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজ রাখেন, না ফেলে দেন?'

ওদিকের জবাবের উত্তরে আবার বললে, 'সব কাগজ ছ-মাস পর্যন্ত রাখা থাকে? খুব ভাল কথা। তা হলে ষোলোই মার্চ তারিখের ইংরেজি কাগজগুলো বার করে দেখুন। বেশি খুঁজতে হবে না। একটা ইংরেজি কাগজের একেবারে প্রথম পাতারই বাঁ দিকের তলাতে একটা খবর পাবেন। কাগজটা পেলেন কি না এবং খবরটা পড়ে কী বুঝলেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন জানান। যান, এখুনি খোঁজ করুন।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে বেশ একটু খুশি মুখেই পরাশর এবার আমার কাছে এসে বসে বললে, 'বলো, কী শুনতে চাও?'

পরাশরের হেঁয়ালি করার ধরনে মনটা তখন খিচড়ে আছে। একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বললাম, 'শুনতে তো অনেক কিছুই চাই, কিন্তু তুমি তো খোলসা করে কিছু বলবে না। সুতরাং যেটুকু কৃপা করে বলতে চাও, তা-ই শুনি।'

'আরে রাগ করছ কেন? সবই তো বলছি।' পরাশর হেসে উঠে বললে, 'তবে সত্যিই বলবার বেশি কিছু নেই। শোভনা দেবী শেষ যে ছবিতে নামেন তার পেছনে টাকা ছিল আদিত্যপ্রতাপ চৌধুরির। আদিত্যপ্রতাপ বনেদি বড়ঘরের ছেলে। এককালে প্রায় রাজত্ব বলা যায়, এমন জমিদারি ছিল। জমিদারি গেলেও ঐশ্বর্য কমবার বদলে বরং বহুগুণ বেড়েছে। এ দেশের বড় বড় বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানে আর ব্যবসায়ী কোম্পানিতে আদিত্যর শেয়ারের পরিমাণ প্রচুর। তার ওপর শুধু কলকাতা নয়—দিল্লি, বোম্বাই, কানপুরে তার প্রাসাদ গোছের সব বাড়ির আয় যে কত কেউ জানে না। আদিত্য শৌখিন শিক্ষিত এ যুগের ছেলে। পয়সাকে অবজ্ঞাও করে না, আবার মেতেও থাকে না শুধু তারই নেশায়। বিচক্ষণের মতো সে সবকিছুর ওপর নজর রাখে, কিন্তু নিজে একটু দূরেই সরে থাকে। সিনেমার ছবিতে সে টাকা লাগিয়েছিল, কিন্তু নিজে ছিল নেপথ্যে। তার হয়ে সামনে দেখাশুনা যা করবার করেছে মহীধর প্রধান। মহীধর আদিত্যর বহুকালের বন্ধু, কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের মানুষ। সে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে জীবন আরম্ভ করেছে, বড় বংশের কি পৈতৃক উত্তরাধিকারের কোনও সুবিধা সে পায়নি। নিজের চেষ্টায় ছোট থেকে বড় হতে হতে সে একজন নাম করবার মতো শিল্পপতি হয়ে উঠেছে যৌবন পার হবার আগেই। দুই বন্ধু প্রায় অভিন্ন-হৃদয় বলেই সবাই জানে। মহীধরের গোড়ার দিকের কাজকারবারে আদিত্যর পৃষ্ঠপোষকতাও কিছুটা ছিল। পয়সায় প্রতিপত্তিতে দুজনেই এখন প্রায় সমান। আর এক দিক দিয়েও একটা মিল আছে—দুজনেই অকৃতদার। মহীধর ওই ছবির ব্যাপারেই শোভনা দেবীর সংস্পর্শে এসে প্রেমে পড়ে। তারপর একদিন শোভনা দেবীকেও বোধহয় অবাক করে বিয়ের প্রস্তাব করে বসে। শোভনা দেবীর মত পাবার পর বন্ধু আদিত্যকে মহীধর সব কথা জানায় ও তার সঙ্গে শোভনা দেবীর পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। আদিত্যর যাকে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম। আর সে প্রেম একেবারে বাঁধভাঙা বন্যা। শোভনা দেবীর মনের কথা তিনিই জানেন, কিন্তু ব্যাপার এইরকম সঙ্গিন হবার পর সত্যিই এতদিন ধরে দুজনের কাউকেই তিনি বরণ করতে রাজি হননি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে দুই বন্ধুর মধ্যে একটা বোঝাপড়া হবে হয়তো আশা করেছেন, কিন্তু তা হয়নি। তার বদলে আজ একটা বিস্ফোরণই হতে চলেছে।'

'আজ সত্যিই একটা কিছু ঘটবে তুমি মনে করো?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হলে গোড়ায় শোভনা দেবীকে সাহায্য করতে রাজি হচ্ছিলে না কেন?'

'সাহায্য যার সবচেয়ে দরকার তাকেই করব বলে!' পরাশরের আবার সেই হেঁয়ালি।

এ হেঁয়ালি আপাতত অগ্রাহ্য করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তুমি ওদের তিনজনের এত কথা,

মায় আদিত্যর পিস্তল চুরি যাবার খবর পর্যন্ত জানলে কী করে?'

পরাশর উত্তর দেবার আগেই ফোন বেজে উঠল।

পরাশর উঠে গিয়ে ফোন ধরে উৎফুল্ল হয়ে আলাপ শুরু করলে, 'যাক, পেয়েছেন তা হলে! মানেটাও বুঝেছেন? কী বুঝলেন?'

ওদিকের জবাবটা শুনে পরাশর অত্যন্ত খুশি হল যেন। বললে, 'বাঃ চমৎকার। আপনার তো কারও পরামর্শের দরকারই নেই। আপনার নিজের বুদ্ধিই যথেষ্ট।'

তারপর ওপক্ষের কথা শুনে পরাশর যা বললে, তাতে আমি একেবারে হতভম্ব। বললে, 'ইয়ে, ঠিকই ধরেছেন খুনটা আর এড়ানো যাবে না। না, কোনও ভাবনা নেই। তারপর যা সামলাবার আমি সামলাব।'

পরাশর ফোনটা নামিয়ে রাখতেই বিমূঢ়ভাবে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না। আঙুল তুলে আমায় থামিয়ে পরাশর আর একটা নম্বর ডায়াল করল।

সংযোগ হবার পর, পরাশরের কথায়, লালবাজারেই কাউকে নিশ্চয় ফোনে ডেকেছে বলে মনে হল।

'হ্যালো! কে বলছেন, লাহিড়ী?' পরাশর বললে, 'হ্যাঁ, আমি পি, বি। শুনুন, খানিক বাদেই একটা খুন হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবেই। না, খুনোখুনি আর ঠেকাতে পারা যাবে না। যা হবার হয়ে যাক, তারপর যা করবার করতে হবে। অর্থাৎ একটা পুলিশ ভ্যান আর একটা অ্যাম্বুলেন্স।—কোথায় বলছেন? নিউ আলিপুরে শিল্পপতি মহীধর প্রধানের বাড়িতে—'

লালবাজারের হোমরা চোমরা যিনিই ফোন ধরে থাকুন, পরাশরকে নিশ্চয় বিলক্ষণ তিনি চেনেন। নইলে পরাশরের এরকম বেয়াড়া রসিকতা বরদাস্ত করতেন না বোধহয়, অন্তত ফোনটা নামিয়ে দিতেন। পরাশরের পরের কথায় কিন্তু বোঝা গেল যে ওর এ রসিকতাটা তাঁর পক্ষে একটু বেশি গুরুপাক হয়ে গেছে।

'রসিকতাটা বুঝতে পারছেন না?' পরাশর বললে, 'রসিকতা মনে করলে আর বুঝবেন কী করে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি গিয়েই সাক্ষাতে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে 'আমায় এখুনি লালবাজারে যেতে হচ্ছে, কিছু মনে কোরো না' বলে যেভাবে পরাশর তারপর বেরিয়ে গেল তাতে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বাড়ি ফিরলাম।

পরাশর নিছক বেয়াড়া রসিকতা যে করেনি, পরের দিনই তার পরিচয় পাওয়া গেল।

খবরের কাগজের বিবরণ অবশ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত। ছোট ছোট অক্ষরে শোচনীয় দুর্ঘটনা শিরোনামা দিয়ে তিনের পাতার একেবারে তলায় সামান্য একটু সংবাদ ছেপেছে—নামধাম কিছু না দিয়ে। লিখেছে, 'পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, গতকল্য বেলা বারোটায় কলিকাতার বিশিষ্ট একজন ধনী ব্যক্তি পিস্তলের গুলিতে আহত হইয়া মুমূর্ষু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। পুলিশ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছে।'

আসল বিস্তারিত খবর আমি অবশ্য পরাশরের মারফতই পেলাম।

সকালবেলাই তার ফোন এল—'একবার আসতে পারো এখুনি? আমি বাড়িতেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

গতকালের ব্যবহারের কথা মনে করে কড়া একটু কিছু বলতে চেয়েও পারলাম না। পরাশরের অনুরোধ না মানা আমার পক্ষে কঠিন, তার ওপর কৌতূহলও আছে প্রচণ্ড।

যতখানি সম্ভব নিরুৎসুক গলায় তবু বললাম, 'কী জন্যে যেতে বলছ? কবিতা শোনাতে?

'না, না', পরাশর আশ্বাস দিলে, 'তোমায় নিয়ে একবার মহীধর প্রধানের বাড়ি যাব।'

আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তা হলে মহীধরই খুন হয়েছে? খবরের কাগজে অবশ্য নাম দেয়নি, তবু পড়েই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'তোমার সন্দেহ ভুল।' পরাশর গম্ভীরভাবে জানালে, 'গুলি খেয়ে হাসপাতালে গেছে আদিত্যপ্রতাপ!'

'আদিত্যপ্রতাপ!' সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'কে তাকে মারলে? মহীধর?'

'না। মহীধর আদিত্যর ধারে কাছেও ছিল না। আদিত্য নিজের পিস্তলের গুলিতেই আহত হয়েছে। আত্মহত্যাই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ফোনের বদলে এখানে এসেই বিবরণটা শুনলে ভাল হত না?'

পরাশরের ধমক খেয়ে ফোন ছেড়ে তখুনি তার বাড়ি রওনা হলাম।

সেখান থেকেমহীধরের বাড়িতে যাওয়া কিন্তু হল না। সবে বার হতে যাচ্ছি, এমন সময় প্রায় উন্মাদিনীর মতো শোভনা দেবী এসে বাইরের ঘরে ঢুকলেন। কাল যাঁকে অত উদ্‌বেগ অস্থিরতার মধ্যেও চেহারা-পোশাকে যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন পরিপাটি দেখেছি, আজ তাঁর মূর্তি একেবারে ভিন্ন। অগুছালো পোশাক, এলোমেলো অগোছালো চুল। মুখেচোখে একটা গভীর যন্ত্রণার ছাপ। সারারাত না ঘুমিয়ে যেন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছেন মনে হয়। উন্মাদিনীর বদলে আহত বাঘিনী বলাই বোধহয় উচিত।

ঘরে ঢুকে যে তারই মতো কাতর তীব্র অথচ হিংস্র স্বরে পরাশরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, 'কেন? কেন আপনি মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলেন? কেন বলেছিলেন সাহায্য করবেন?'

'সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য তো আমি করেছি শোভনা দেবী।' শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললে পরাশর, 'মহীধরকে তো আদিত্য স্পর্শ করতে পর্যন্ত পারেনি!'

'না, তা পারেনি।' শোভনা দেবীর গলার স্বর কান্নায় প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল। 'কিন্তু আদিত্যর এই হবে, তা কিছুতে চেয়েছিলাম! কেন তাকে আপনি বাঁচাতে পারলেন না?'

'আপনার এ বিপদের কথা তখন তো এতটুকু বুঝতে দেননি, শোভনা দেবী।' পরাশরের গলা এবার সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ।

'না, তা দিইনি।' শোভনা দেবী একেবারে ভেঙে পড়লেন, 'তাকে পর্যন্ত কোনওদিন দিইনি বুঝতে। কিন্তু তা বোঝা উচিত ছিল।'

'বুঝলে এমনভাবে আত্মহত্যা আদিত্য বোধ হয় করত না।' পরাশরের গলায় এবার যেন একটু বিষণ্ণ ভর্ৎসনার সুর।

'কিন্তু আত্মহত্যা করবারই বা কী তার কারণ ছিল?' শোভনা দেবী যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেরকম মানুষ সে তো নয়।'

'তা হলে আপনি কি আর কিছু সন্দেহ করেন?' পরাশরের স্বর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'সন্দেহ করেন কাউকে?'

'না, না, কেমন করে সন্দেহ করব!' শোভনা দেবী হতাশ স্বরে বললেন, 'আমি যে নিজের চোখে সব দেখেছি। কাউকে সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ যে সেখানে নেই।'

'কী দেখেছেন তা একবার আমায় বলবেন?' পরাশর অনুরোধ জানালে।

'পুলিশের কাছে সবই বলেছি, তবু আপনাকে আবার বলছি।' শোভনা দেবী রুদ্ধস্বরে ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনাকে যেরকম বলে গিয়েছিলাম সেই ভাবেই মহীধরের বাড়ি থেকে আদিত্যকে আনিয়ে গাড়িটা নিতে আসবার জন্যে ফোন করি। মহীধরের দোতলার ঘর থেকে গাড়িটা নীচের ড্রাইভওয়ের মধ্যে যেখানে রাখা ছিল সে জায়গাটা ভাল করে দেখা যায়। আমি ও মহীধর দু-জনে ওপর থেকে সেখানে লক্ষ রেখেছিলাম। ফোনের কিছুক্ষণ বাদেই আদিত্য তার পুরনো একটা গাড়িতে সেখানে আসে। তারপর ওপরে না উঠে নিজের গাড়িটা ড্রাইভওয়েতে রেখে সোজা তাইতেই গিয়ে উঠে বসে। সে আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই গাড়িটা নিয়ে চলে যাবে কি না যখন ভাবছি তখনই গাড়ি থেকে পিস্তলের সেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনলাম। সেই সঙ্গে আদিত্যর আর্তনাদ।'

বলতে বলতে কান্নায় শোভনা দেবীর গলা একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল।

পরাশর একটু অপেক্ষা করে, একটু দ্বিধাভরেই যেন জিজ্ঞাসা করলে, 'মহীধর তখন কোথায়?'

'সে আমারই পাশে দাঁড়িয়েছিল।' নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন শোভনা দেবী, 'পিস্তলের শব্দ শুনেই সে ছুটে নীচে নেমে যায়। আমিও তার পেছন পেছন যাই। আমি গাড়ির কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতে মহীধর গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে পাঁজাকোলা করে আদিত্যকে গাড়ি থেকে নামায়, আর সেই নামাবার সময়ে গাড়ির নীচে পড়ে থাকা রিভলভারটা তার চোখে পড়ে। সে রিভলভার আদিত্যর। আমি অবশ্য এসব কিছুই তখন খেয়াল করিনি। আদিত্যর সেই রক্তমাখা—'

শোভনা দেবী থেমে গেলেন।

পরাশর শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'আদিত্যর সে অবস্থা দেখে আপনি বেহুঁশ বিহ্বল হয়ে গেছলেন। সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।'

শোভনা দেবী একটু চুপ করে থেকে আবার মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বেহুঁশ হয়ে মেঝের ওপরেই বসে পড়ে একটু বেহুঁশ হয়ে গেছলাম। হুঁশ যখন হল তখন দেখি ঝুঁ লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্সের লোক কখন এসেছে আমি জানি না। তারা আদিত্যকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি সঙ্গে যেতে চাইলাম, তা দিলে না। শুনছি নার্সিংহোমে যে কোনও মুহূর্তে তার শেষ নিশ্বাস পড়তে পারে। এতক্ষণ পড়েছে কি না কে জানে! তার সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না। আমার সঙ্গে শেষ দেখা তার আর হল না।'

শোভনা দেবী দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে চাপা কান্নার বেগে কাঁপতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ তাঁকে সেই ভাবে থাকতে দিয়ে পরাশর গাঢ় শান্ত স্বরে বললে, 'তার সঙ্গে শেষ দেখা আমি করিয়ে হয়তো দিতে পারি। কিন্তু আপনি সে দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন কি?'

'পারব! পারব!' শোভনা দেবী আকুল হয়ে উঠলেন, 'আর আমার সহ্য করতে পারাটাই কি সব? আমার ক-টা কথা তাকে শুধু বলতে চাই। বিন্দুমাত্র চৈতন্য যদি তার থাকে, তা হলে আমার শেষ ক-টা কথা সে শুনে যাক।'

'বেশ, চলুন তা হলে। তুমিও এসো, কৃত্তিবাস,' বলে উঠে দাঁড়িয়ে পরাশর টেবিলের ড্রয়ার টেনে বার করে যা হাতে নিল, সেটা গতকালের পুরনো সেই কাগজটা বলেইমনে হল।

কোনও নার্সিংহোমে কিন্তু নয়, পরাশর প্রথমেই আমাদের যেখানে নিয়ে গেল, সেটা মহীধর প্রধানের বাড়ি।

'এখানে কেন নিয়ে এলেন, মিস্টার বর্মা?' শোভনা দেবী বিস্মিত অনুযোগ জানালেন।

'মহীধরকেও শেষ দেখা করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় কি?' পরাশর যেনবিষণ্ণভাবে হেসে বললে, 'আপনার মতো না হোক, বন্ধুর এই পরিণামে সে-ও নিশ্চয় মস্ত বড় আঘাত পেয়েছে।'

দেখা হবার পর পরাশরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে হল। মহীধরকে আগে কখনও দেখিনি। যে চেহারা তার দেখলাম তা যেন ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেঙে পড়া একটা বিশাল গাছের।

তার দোতলার বসবার ঘরেই আমাদের ডাকিয়ে, মহীধর যেরকম ক্লান্ত উদাসীনভাবে কথা বলল, তাতে মনে হল মৌখিক ভদ্রতাটুকু রাখাই তার পক্ষে কঠিন হচ্ছে।

ঘরে এসে ঢোকার পর থেকে একবারও শোভনা দেবীর দিকে সে যে তাকায়নি, তা লক্ষ করেছি।

পরাশর নিজের ও আমার পরিচয় দেবার পর মহীধর ক্লান্ত স্বরে বললে, 'আপনারা কেন এসেছেন জানি না। কিন্তু বেশিক্ষণ সময় আপনাদের দিতে পারব না। খালি বলেই আমি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি।'

চলে যাচ্ছেন পরাশর বিস্ময় প্রকাশ করলে, 'কোথায় যাচ্ছেন? কতদিনের জন্যে?'

'জানি না।' মহীধরের জবাবটা একটু রূঢ়।

'কিন্তু আদিত্যপ্রতাপকে একবার শেষ দেখা দেখে যাবেন না?' পরাশর মহীধরের রূঢ়তা অগ্রাহ্য করে বললে, 'আমরা আপনাকে সেই জন্যেই নিতে এসেছি।'

'সেই জন্যে এসেছেন?' মহীধর একটু বিষণ্ণ হেসে বললে, 'কিন্তু সে তো এখন সব দেখা-শোনার বাইরে। কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতেও দিচ্ছে না শুনলাম।'

'তবু দেখার ব্যবস্থা করতে পারি।' আশ্বাস দিলে পরাশর, 'যদি চান তো আমাদের সঙ্গে চলুন।'

মহীধর পরাশরের মুখের দিকে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ যেন মনস্থির করে ফেলে বললে, 'না, আমি শেষ দেখা করতে চাই না।'

'তা হলে আর আপনার সময় নষ্ট করব না।'

পরাশর উঠে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে আমরাও।

দরজার দিকে যেতে গিয়ে পরাশর কিন্তু হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, একটা কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। যেখানে আদিত্যর গাড়িটা ছিল, তার কাছে খোঁজ করতে গিয়ে পুলিশ একটা লম্বা তার পেয়েছে, সেটা কি আপনি গাড়ির ভেতর দেখেছিলেন?'

'যদি দেখে থাকি,' মহীধর একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললে, 'আদিত্যকে ওই অবস্থায় দেখবার পর সেটা কি মনে থাকবার কথা?'

'হ্যাঁ, তা বটে।' পরাশর স্বীকার করলে, 'কিন্তু এইটে আপনি একদিন দেখেছেন কিনা আশা করি মনে করতে পারবেন।'

পরাশর এগিয়ে গিয়ে সেই পুরনো খবরের কাগজটাই মহীধরের সামনে মেলে ধরল।

কয়েক মুহূর্ত মধ্যে মহীধরের অত পরিবর্তন হবে ভাবতে পারিনি।

কাগজটার ওপর চোখ বুলোবার পরই সমস্ত মুখ যেন তার হিংস্র জ্বলন্ত হয়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে একটা ভয়ঙ্কর অবসাদ নেমে এল সেখানে।

ক্লান্ত ক্ষোভে স্বরে মহীধর বললে, 'তারের কথা জিজ্ঞেস করে আর এ-কাগজ দেখিয়ে আপনি যদি এইকথাই বলতে চান যে আদিত্যর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী তা হলে সেকথা আমি স্বীকার করছি। সত্যিই আমি তাকে মেরেছি। দিনের পর দিন হিংসায় ঈর্ষায় জ্বলে জ্বলে আমি পাগল হয়ে গেছলাম। শোভনা সত্যি করে আদিত্যকেই ভালবাসে যেদিন থেকে স্পষ্ট করে বুঝেছি, সেই দিন থেকেই তাকে একেবারে সরিয়ে দেবার চিন্তা মনের ভেতর বার বার উঁকি দিয়েছে। তবে ধীরে ধীরে সে চিন্তা যেন কুণ্ডলী খুলে বিষফণা তুলেছে। তারপর কাগজে ওই খবরটা দেখবার পর—'

মহীধর এক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে আবার বললে, 'আমায় পুলিশের কাছে নিয়ে চলুন। সব কথা আমি স্বীকার করব। বিচারে চরম দণ্ডই আমি চাই। আদিত্য এখন হয়তো আর নেই। তার এই মৃত্যুর আঘাতে আমি বুঝেছি যে ওর বন্ধুত্বের দাম আমার কাছে কতখানি ছিল। মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকেও আমি ভাল করে চিনিনি। আজ তাকে ফেরাতে পারলে নিজের হাতে ওদের বিয়ে দিয়ে আমি ওদের পাশে থাকাই জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ মনে করতাম। কিন্তু তা আর হবার নয়। চলুন আমায় নিয়ে চলুন লালবাজারে। কিংবা তাদেরই এখানে ডাকুন।

'কিন্তু তাতে লাভ কী হবে?' পরাশর একটু দুঃখের হাসির সঙ্গে বললে, 'আপনি চরম শাস্তি পেলেও যা হয়ে গেছে তা তো আর বদলানো যাবে না।'

'তবু চরম শাস্তিই আমি চাই!' মহীধরের স্বর এবার দৃঢ়, 'নিজের হাতেই প্রায়শ্চিত্ত করব বলে আমি চেয়েছিলাম। তার চেয়ে এই ভাল। দিনের পর দিন বিচারের যে চরম লাঞ্ছনা,

যন্ত্রণা ও শাস্তি, তা-ও আমি ফাঁকি দিয়ে এড়াতে চাই না।'

'তা হলে বলি মিস্টার প্রধান,' পরাশরের মুখে এবার যেন দুর্বোধ্য একটু হাসি, 'শাস্তি যা পাবার তা আপনি পেয়েছেন। তাতেই আপনার হৃদয়ের সমস্ত ময়লা গ্লানি ধুয়ে পবিত্র হয়ে গেছে। এই অবস্থাতেই আদিত্যর সঙ্গে দেখা হওয়া আপনার এখুনি দরকার।'

'ঠিকই বলেছেন।' মহীধর সমর্থন করলে, 'চলুন, তার কাছেই আগে যাই।'

'যেতে হবে না।' পরাশর অদ্ভুতভাবে হাসল, 'আদিত্যপ্রতাপ নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। নীচে গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম।'

'আদিত্য আসছে!' মহীধর ও শোভনা দেবী দু-জনেরই বিমূঢ় কণ্ঠ একসঙ্গে শোনা গেল।

'হ্যাঁ, আপনাদের জীবনের দুশ্ছেদ্য জট ছাড়াবার একটা সস্তা কৌশল আমি করেছিলাম। তা সফল হওয়ার তৃপ্তিটুকু নিয়ে যাচ্ছি। এসো কৃত্তিবাস।'

বলা বাহুল্য পথে যেতে যেতে প্রশ্নবাণে পরাশরকে অস্থির করে তুললাম।

সে প্রশ্নোত্তরের যথাযথ বিবরণ অতি দীর্ঘ। সংক্ষেপে তার মূল সারাংশটুকু কেবল তাই জানাচ্ছি। আদিত্যপ্রতাপ মহীধরের উন্মত্ত হিংসা লক্ষ করে সাংঘাতিক কিছু একটা সে করতে পারে, এই ভয়ে তার পিস্তল চুরি যাবার পরই পরাশরের সাহায্য চেয়েছিল। মহীধরের গ্যারাজেই আদিত্যর গাড়ি মেরামত হচ্ছে ও শোভনা দেবীর সরল বুদ্ধিতে তাদিতে আদিত্যকে আনানোর একটা ওই রকম ব্যবস্থা হয়েছে জেনেই পরাশরের কিছুকাল আগে-পড়া একটা খবরের কথা মনে পড়ে যায়। পুরনো খবরের কাগজ ঘেঁটে খবরটা বার করে পড়ে তার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস হয়, মহীধর আদিত্যকে মারবার ওই ধরনের একটা ফন্দি করেছে। আদিত্যর পিস্তলটা সেই জন্যেই সে আগে চুরি করেছিল। কাগজে আমেরিকার এই ধরনের একটি হত্যা-কৌশলের খবর ছিল। গাড়ির ক্লাচের সঙ্গে তার দিয়ে একটি রিভলভার এমন ভাবে স্টিয়ারিং হুইলের নীচে বাঁধা ছিল যে ক্লাচ টেপামাত্র গুলি ছুটে চালক নিহত হয়—ঘটনাটাকে আত্মহত্যার চেহারা দেবার সুযোগও মহীধর করে নিয়েছিল। দূর থেকে গুলির আওয়াজের পর সে-ই প্রথম ছুটে যায় গাড়ির কাছে। সেখানে তারটা খুলে পিস্তলটা গাড়ির মধ্যে এবং তারটা বাইরে ফেলা কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। পরাশর কিন্তু কৌশলটা অনুমান করে আগে থাকতেই আদিত্যকে তার যা করণীয় বলে দিয়েছিল। আদিত্য ক্লাচ না টিপে তারে বাঁধা পিস্তলটাই ঘুরিয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে সশব্দে ছুড়ে দেয়। তারপর বুকে গুলি লেগেছে বোঝাবার জন্যে ফুটো জামা থেকে নকল রক্তপাত দেখিয়ে মুমূর্ষুর অভিনয় করে। সে সময়ে মহীধরের খুঁটিয়ে কিছু দেখবার অবস্থাও ছিল না। তা ছাড়া পরাশরের গোপন ব্যবস্থায় পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স এসে তখুনি সব ভার নিয়ে আদিত্যকে এক নার্সিংহোমে এনে লুকিয়ে রাখে। এর বন্ধু বড় পুলিশ কর্তার সাহায্যে পরাশর এইরকম ব্যবস্থাই করে রেখেছিল।

মহীধরের সাময়িক উন্মত্ততা এইভাবে সারিয়ে জটিল এক ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যার এমন মধুর সমাধান সে যে করতে পেরেছে, এইখানেই পরাশরের বাহাদুরি।